ট্যাকিয়ন

অক্টোবর ২০২১ সংখ্যা

কসমিক ইনফ্লেশান
মিউয়ন জি মাইনাস টু
মহাবিশ্বের আগে সৃষ্ট নক্ষত্র

গ্যালাক্সির প্রকারভেদ
কসমোলজির বইগুলো
গ্রহের সৌন্দর্য : মেরুজ্যোতি

tachyonts.com

The Universe is out there, waiting for you to discover it.

-Ethan Siegel

সম্পাদক
কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ
সহসম্পাদক
মুসতাভি আসহাব বিহন

ফ্যাক্ট চেকার
নাজমুল সরদার আশিক
রিফাত হাসান
রুশলান রহমান দীপ্ত
সিফাত হাসান

ডিজাইন
রাতুল হোসেন
আনিকা নাসরিন
তাসমিয়া

প্রকাশক
ট্যাকিয়ন

লেখকগণ
যোনাথন হাসদা
মো: আক্তারুজ্জামান
আশরাফুল ইসলাম মাহি
আজমাইন তৌসিক ওয়াসি
আল যুবায়ের অংকন
সাইদুল হোসেন আল আমিন
মো: সাজিদ রায়হান
কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ
নুসরাত জাহান
ফাহমিদা হক হৃদি
আবিরা আফরোজ মুনা
সাজ্জাদুর রহমান
রুশলান রহমান দীপ্ত
রওনক শাহরিয়ার
নাজমুল সরদার আশিক
শাহরিন উৎসব

প্রুফ রিড
মো: ওয়াসিমুল ইসলাম রাব্বি

আমাদের সাথে যুক্ত হতে
ফেসবুক গ্রুপ https://www.facebook.com/groups/tachyonts
ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/TachyonTs
ওয়েবসাইট https://tachyonts.com/

যেখানে যা পাবেন

ফসিলের বয়স নির্ণয় করা হয় কীভাবে? ... ৫

কসমিক ইনফ্লেশান ... ৭

মিউয়ন জি মাইনাস টু ... ১৪

ডাটা সায়েন্সে হাতেখড়ি (পর্ব ১) ... ২২

লাল গ্রহে অগ্নিদেবতা ... ২৭

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের খুঁটিনাটি ... ৩২

ধূমকেতুর আদ্যোপান্ত ... ৩৭

মহাবিশ্ব সৃষ্টির সামান্য পরেই তৈরি হয়েছিল যে নক্ষত্র ... ৪২

শুক্র গ্রহে নাসার দুই মিশন ... ৪৫

গ্রহের সৌন্দর্য - মেরুজ্যোতি ... ৪৬

ল্যানিয়াকিয়া - আমরা যেখানে বসবাস করি ... ৪৯

এক্সোপ্ল্যানেটে ঘুরাঘুরি ... ৫২

ব্ল্যাকহোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স ... ৫৮

দ্য স্টারি নাইট ... ৬২

নিউট্রন-তারাকে গিলে খেলো ব্ল্যাকহোল ... ৬৫

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কত? ...৬৮

গ্যালাক্সির প্রকারভেদ ... ৭০

তারিখের সমস্যা ... ৭৫

রেডিয়ো টেলিস্কোপের টুকিটাকি... ৭৮

বর্ষসেরা অ্যাস্ট্রোনমি ফটোগ্রাফি ... ৮২

কসমোলজির বইগুলো ... ৮৩

দিনের বেলায় চাঁদ ... ৮৮

মহাকর্ষ ... ৯০

চাঁদের পানি কি পানযোগ্য?... ৯১

ফসিলের বয়স নির্ণয় করা হয় কীভাবে?

যনাথন হাসদা

‘ফসিল’ কী?

সাধারণত জীবের দেহ থেকে ফসিল তৈরি হয়। এক্ষেত্রে সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে কোনো উদ্ভিদ বা প্রানী যখন মারা যায় তখন দীর্ঘ বছর পরিক্রমায় এটি মাটির নিচে অর্থাৎ ভূগর্ভে চাপা পড়ে থাকে। ফলে লক্ষ-কোটি বছর পর সেই উদ্ভিদ বা প্রানীর দেহ মাটির নিচের উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার কারণে একসময় ফসিলে পরিণত হয়। যে পদ্ধতিতে সাধারণত ফসিলের বয়স নির্ণয় করা হয় তাকে বলা ‘কার্বন-ডেটিং’।

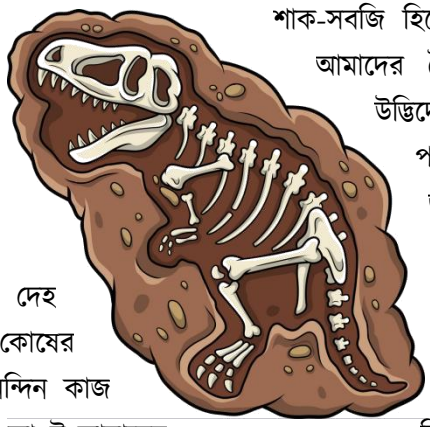

ফসিলে শক্তি উৎপাদন

আমরা জানি যে আমাদের দেহ অর্থাৎ জীবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে তৈরি। আমাদের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করতে সেই সকল কোষই আমাদের শক্তি প্রদান করে থাকে। কোষের শক্তি প্রদান করে মাইটোকন্ড্রিয়া। একে কোষের পাওয়ার হাউস বা শক্তি ঘরও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এখানে শক্তি উৎপন্ন হয় কীভাবে?

আমরা জানি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে একধরনের গ্যাসীয় বিনিময় সর্বদা সংঘটিত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলে O_2 ত্যাগ করে এবং CO_2 গ্রহণ করে। আর আমরা অর্থাৎ প্রানীরা CO_2 ত্যাগ করে এবং O_2 গ্রহণ করি। উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের জন্য শক্তি উৎপন্ন করে প্রকৃতির মাঝে টিকে থাকে, আমরা আমাদের চলাফেরা করার কাজে শক্তি পাওয়ার জন্য প্রকৃতি হতে অনেক উপাদানই গ্রহণ করে থাকি। উদ্ভিদকে সে সময় আমরা শাক-সবজি হিসেবে রান্না করে খেয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করি। উদ্ভিদের থেকে প্রাপ্ত কার্বোহাইড্রেট পরিপাকতন্ত্রের পৌঁছানোর পর জটিল কার্বোহাইড্রেট (স্টার্চ) প্রথমে এনজাইমের হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে সরল কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হয় এবং অন্ত্রে সরল উপাদান হিসেবে শোষিত হয়। (যদিও কিছু কিছু কার্বোহাইড্রেটের ডাইজেশন হয় না । যেমন: সেলুলোজ, পেকটিন, লিগনিন ইত্যাদি) এভাবে সরল কার্বোহাইড্রেট শোষিত হয় এবং পরবর্তীতে কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপে এর শ্বসন হয়। এভাবে সরল কার্বোহাইড্রেট শোষিত হয় এবং পরবর্তীতে কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপে এর শ্বসন হয়।

কার্বন শনাক্তকরণ

যখন আমাদের মৃত্যু হয় তখন সেই কার্বনের বেশ কিছু অংশও আমাদের মৃত দেহের মাধ্যমে ভূগর্ভে চাপা পড়ে থাকে। প্রকৃতিতে সাধারণত কার্বন-12 পরমাণু বিরাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে কার্বন-14 আইসোটোপও লক্ষ্য করা যায়। C-14 নামক কার্বনের বিশেষ তেজস্ক্রিয় রূপও সেইখানে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। আর এভাবেই এগুলো তখন সেই ফসিলে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে। আর এর সাহায্যেই অর্থাৎ কার্বন-12 ও কার্বন-14 আইসোটোপদ্বয়ের অনুপাতের সাহায্যেই সেই ফসিলের বয়স নির্ণয় করা হয়।

এক্সেলেটর মাস স্পেকট্রোমিটারের ব্যবহার

আমরা জেনেছি যে C-14 হলো কার্বনেরই একটা বিশেষ তেজস্ক্রিয় রূপ। তেজস্ক্রিয় হওয়ায় এটি অনবরত কমতে থাকে। এর অর্ধায়ু হলো 5730 বছর। এর মানে হলো কোনো ফসিলে কার্বন-14 নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকলে তার পরিমাণ অর্ধেকে চলে আসতে 5730 বছর সময় নিবে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে ফসিলে কার্বন-14 আইসোটোপদ্বয়ের পরিমাণ কম, সে ফসিলের বয়স বেশি থাকে। এভাবেই সাধারণত কোনো ফসিলের বয়স নির্ণয় করা হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এক্সেলেটর মাস স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে কার্বন-12 ও কার্বন-14 আইসোটোপদ্বয়ের অনুপাত বের করে ফসিলের বয়স নির্ণয় করে থাকেন।

একটি ভুল ধারণা, সারা জীবনের কান্না

আপনার কি পাঠ্যবই পড়তে পড়তে চোখে ঘুমের পাহাড় নেমে আসে? বইটা দেখলেই ভয় ভয় লাগে? তাহলে আপনার জন্য রয়েছে ভয় কাটানোর সুবর্ণ সুযোগ। আজই যুক্ত হোন আমাদের ফেইসবুক গ্রুপে। সাথে আপনার বিজ্ঞান ভীতু বন্ধুদেরকেও ইনভাইট করুন। একটি বিজ্ঞানে পারদর্শী জাতি উপহার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/tachyonts

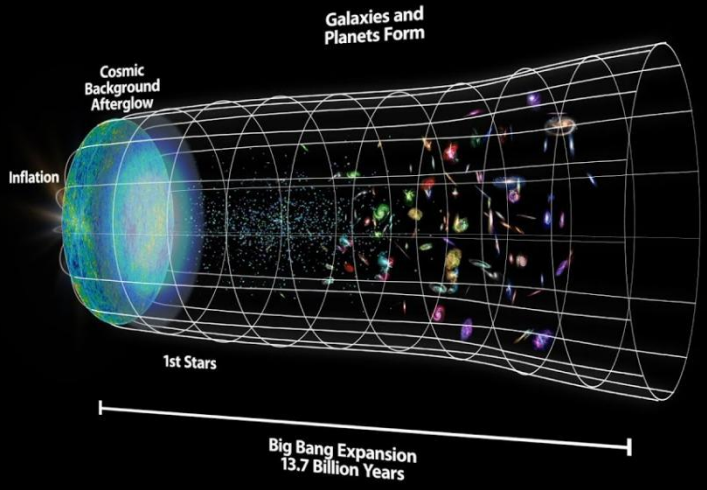

কসমিক ইনফ্লেশান

মোঃ আক্তারুজ্জামান

1929 সালে এডউইন হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে আমাদের মহাবিশ্ব যে সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে প্রসারিত হচ্ছে তা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। গ্যালাক্সিগুলো পর্যবেক্ষণের সময় দেখা যায়, যে গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত বেশি দূরে সে তত বেশি বেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এছাড়া গ্যালাক্সিগুলো হতে আগত আলোর বর্ণালীরেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্ণালীর লোহিতসরণ হচ্ছে। অর্থাৎ বর্ণালীরেখা লাল আলোর দিকে সরে যাচ্ছে। লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি। অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলো হতে আগত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে। এদিকে শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে ডপলার ইফেক্টের মাধ্যমে জানা যায়, শ্রোতার দিকে আগত কোন শব্দ উৎসের কম্পাঙ্ক শ্রোতার কাছে বেশি মনে হবে। অর্থাৎ শ্রোতার কাছে মনে হবে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে। আবার, শব্দ উৎস যখন শ্রোতার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে থাকবে তখন শ্রোতার কাছে মনে হবে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে।

শব্দ যেমন এক প্রকার তরঙ্গ ঠিক তেমনি আলোও এক প্রকার তরঙ্গ। তাই আলোর ক্ষেত্রেও ডপলার ক্রিয়া প্রযোজ্য হবে। এ কারণে কোন আলোক উৎস যখন আমাদের নিকটে আসতে থাকবে তখন আমাদের মনে হবে আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বর্ণালীরেখা নীল আলোর

দিকে সরে যাবে। আবার যখন আলোক উৎস আমাদের থেকে দূরে যাওয়া শুরু করবে তখন আলোক-তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে। অর্থাৎ বর্ণালীরেখা লাল আলোর দিকে সরে যাবে। এ বিষয়টির নাম রেডশিফট (লোহিতসরণ)। যেহেতু হাবলের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে গ্যালাক্সিগুলো হতে আগত আলোর লোহিতসরণ হচ্ছে, তাই স্পষ্টতই গ্যালাক্সিগুলো আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এবার বিজ্ঞানী জর্জ লেমিত্রি এই পর্যবেক্ষণ থেকে বললেন, যদি এভাবে গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে এমন হতে পারে যে দূর-অতীতে এরা সব একজায়গায় আরো কাছাকাছি অবস্থায় ছিল! হয়ত একটি বিন্দুতে মিশে ছিল যেখান থেকে প্রচন্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে তৈরি হলো এই মহাবিশ্ব প্রসারণের খেলা! মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্ট এই মডেলই আমাদের কাছে বিগ ব্যাং মডেল নামে পরিচিত।

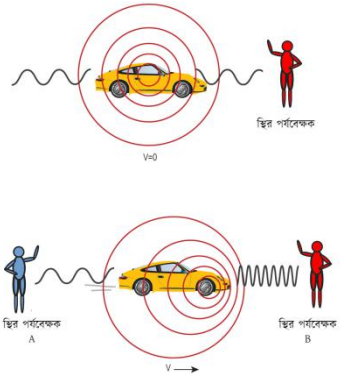

স্থির পর্যবেক্ষকের দিকে কোনো তরঙ্গ উৎস গতিশীল হলে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যায়। ফলে তা লাল দেখায়। স্থির পর্যবেক্ষক থেকে দূরে সরে যাওয়া কোনো তরঙ্গ উৎস গতিশীল হলে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। ফলে তা নীল দেখায়। একে ডপলার ইফেক্ট বলে।

বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে বিগ ব্যাং-এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল। বিগ ব্যাং তত্ত্বের মাধ্যমে ধারণা করা হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে মহাবিশ্ব ছিল খুব উত্তপ্ত এবং সময়ের প্রসারণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব শীতল হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রাথমিক সেই উত্তপ্ত মহাবিশ্বের বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ছিল যার রেশ এখনো কেটে ওঠেনি। একে বলা হয় কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ), সংক্ষেপে CMB। উইলসন এবং পেনজিয়াস 1978 সালে CMB-এর উপস্থিতি শনাক্ত করার জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

এছাড়া প্রাথমিক মহাবিশ্বে (মহাবিশ্বের সৃষ্টি থেকে শুরু করে তিন মিনিটের মাঝে) মূল কণাগুলো থেকে হালকা মৌল সংশ্লেষের প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় বিগ ব্যাং নিউক্লিয়োসিন্থেসিস (BBN)। প্রক্রিয়াটাকে ভারী মৌলের আদিমতম সংশ্লেষন বলা যেতে পারে। বিগ ব্যাং তত্ত্বের মাধ্যমে CMB এবং BBN-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বেশ ভালোভাবে দেওয়া গেলেও কয়েকটি ছোটোখাটো কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাখ্যা বিগ ব্যাং তত্ত্বের মাধ্যমে দেওয়া যাচ্ছিল না। সমস্যাগুলো ছিলো এমন :

১. সমতল মহাবিশ্বের সমস্যা : মহাবিশ্বের ঘনত্ব-সম্পর্কিত হিসাব নিকাশ করে পাওয়া যায়, এখন পর্যন্ত আমাদের মহাবিশ্ব প্রায় সমতল এবং যত দূর অতীতে যাওয়া হবে ততই মহাবিশ্ব সমতল হওয়ার প্রবনতা বাড়ে। দেখা গেছে মহাবিশ্বের শক্তির গড় ঘনত্ব সংকটঘনত্বের থেকে সামান্য বেশি। অর্থাৎ এদের অনুপাতের মান প্রায় 1 এর

কাছাকাছি। মান যখন 1 হয় তখন সেটা সমতল আকার বোঝায়। এক্ষেত্রে ওই তলে একটি ত্রিভুজ আঁকা হলে তিনটি কোণের যোগফল 180 ডিগ্রি হয়। অনুপাতের মান যদি এক থেকে বেশি হয় তাহলে বোঝা যাবে শক্তির গড় ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের চেয়ে বেশি। এ অবস্থায় মহাবিশ্বের আকার হবে গোলক। এক্ষেত্রে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি থেকে বেশি হয়। যদি অনুপাতটি 1 থেকে কম হয় তাহলে সেটা ঘোড়ার জিনের মতো আকৃতি নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে ত্রিভুজের কোণগুলোর সমষ্টি 180 ডিগ্রি থেকে কম হয়। হিসাব করে এই অনুপাতটির মান প্রায় 1 পাওয়া গেছে। তাহলে বলতে পারি আমাদের মহাবিশ্ব প্রায় সমতল। কিন্তু এ ব্যাপারটি তো বিগ ব্যাং তত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। তাহলে উপায়?

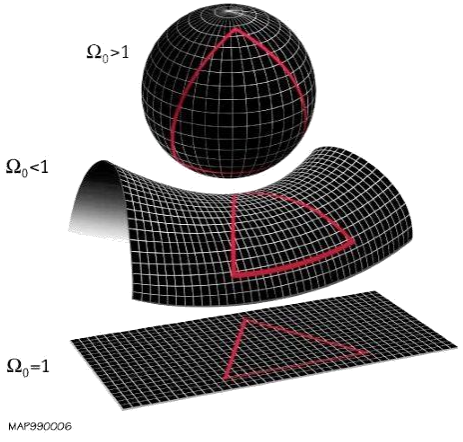

মহাবিশ্বের শক্তির গড় ঘনত্ব ও সংকটঘনত্বের অনুপাতকে Ω_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মান 1 হলে তা সমতল মহাবিশ্বকে নির্দেশ করে।

২. এক মেরুর সমস্যা : একটি দন্ড চুম্বকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকে। এই চুম্বকটিকে অর্ধেক করলেও দুইটি মেরু পাওয়া যায়। আমরা সকলেই হয়ত জেনে এসেছি উত্তর মেরু থাকলে একই সাথে দক্ষিণ মেরুও থাকবে। কিন্তু শুধুমাত্র একটি মেরু পাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বিগ ব্যাং তত্ত্ব। প্রচুর সংখ্যক স্থায়ী ম্যাগনেটিক মনোপোলের (চৌম্বকীয় এক মেরু) অস্তিত্ব ছিল প্রাথমিক সেই সময়টিতে। কিন্তু সমস্যা হলো মনোপোলগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? যদি বহুসংখ্যক স্থায়ী মনোপোল তখন থাকত তাহলে তো আমরা এখন তা খুঁজে পাবো। কিন্তু কোথায় সেগুলো?

৩. CMB এর তাপমাত্রাসমস্যা-দিগন্তসমস্যা : উইলসন এবং পেনজিয়াসের CMB শনাক্ত করার মাধ্যমে আমাদের মহাবিশ্বের একটি বর্ণিল-মডেল সামনে চলে আসে। এ মডেল অনুসারে বেশি তাপমাত্রার অঞ্চল এবং কম তাপমাত্রার অঞ্চলের তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু মূল সমস্যাটা হলো বেশি তাপমাত্রার অঞ্চল এবং কম তাপমাত্রার অঞ্চলের তাপমাত্রার পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্রায় একই তাপমাত্রা সবজায়গায়। কিন্তু বিগ ব্যাং তত্ত্ব যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তো এটা সম্ভব না। হিসাব করে পাওয়া যায় বিগ ব্যাং-এর সূচনা আজ থেকে প্রায় 13.8 বিলিয়ন বছর আগে। তাহলে একদিকে যে তাপমাত্রা পাওয়া যাবে, তার ঠিক বিপরীত দিকে তো সেই একই তাপমাত্রা পাওয়ার কথা, না? কারণ এই দুই বিপরীত স্থানের একটি হতে

অপরটিতে আলো যেতেই যে সময় লাগবে তা 13.8 বিলিয়ন থেকে বেশি। নিচের চিত্রটিতে A ও B বিন্দু দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব 27.6 বিলিয়ন আলোকবর্ষ হওয়া সত্ত্বেও এদের তাপমাত্রা প্রায় একই! অর্থাৎ সহজ ভাষায় মূল সমস্যাটি হলো দুইটি স্থানের মাঝে কোন সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এদের তাপমাত্রা সাম্যাবস্থায় পৌঁছালো?

এই সমস্যাগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে 1980 সালে অ্যালান গুথ (Alan Guth) ইনফ্লেশন তত্ত্ব প্রদান করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে অতিক্ষুদ্র-আকারের মহাবিশ্ব অতিদ্রুত একটি প্রসারণের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। এই প্রসারণ এতই দ্রুত হয়েছিল যে সেকেন্ডের অতিক্ষুদ্র ব্যবধানে আমাদের মহাবিশ্ব 1026 গুন প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। এই বৃহৎপরিসরের প্রসারণকে ইনফ্লেশন বলা হয়। এখন মূল প্রশ্ন হলো ইনফ্লেশন তত্ত্ব কীভাবে বিগ ব্যাং মডেলের সমস্যাগুলো সমাধান করে?

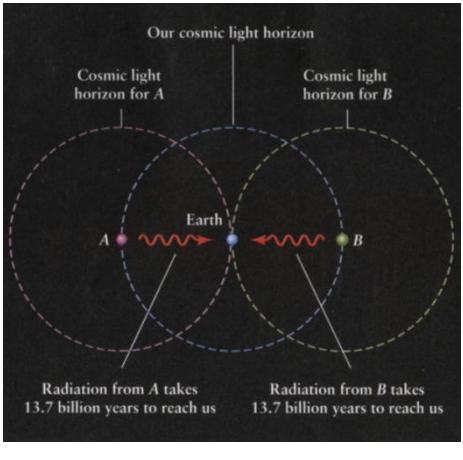

১. সমতল মহাবিশ্বের সমস্যার সমাধান : নিচের চিত্রটিতে বেলুনটির উপর একটি পিঁপড়া অবস্থান করছে। যেহেতু বেলুনটা প্রাথমিক অবস্থায় কম বাতাসপূর্ণ অবস্থায় আছে তাই এমতাবস্থায় পিঁপড়াটি সহজেই বেলুনের পৃষ্ঠতলের বক্রতা অনুধাবন করতে পারবে। কিন্তু বেলুনটি যদি বেশি পরিমাণ প্রসারিত হয়ে যায়, তাহলে পিঁপড়াটির কাছে মনে হবে সে আদতে প্রায় সমতল একটি পৃষ্ঠতলে অবস্থান করছে। ঠিক যেমন আমাদের পৃথিবী উপগোলক হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাসী। ঠিক এমনটিই হয়েছিল ইনফ্লেশনের মাধ্যমে। মুহূর্তের মাঝে বিপুল প্রসারণ হওয়ায় প্রাথমিক অবস্থার অতি ক্ষুদ্র মহাবিশ্বে বক্রতা থাকলেও ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সে বক্রতল প্রায় সমতলে পরিণত হয়েছে। আর আমরা তো পর্যবেক্ষণ করি এই বিশালতার সামান্য একটি অংশ নিয়ে। তাই আমাদের দৃষ্টিতে সমতল ছাড়া কিছুই মনে হয় না। একারণেই আমাদের পর্যবেক্ষণে মহাবিশ্ব প্রায় সমতল মনে হয়।

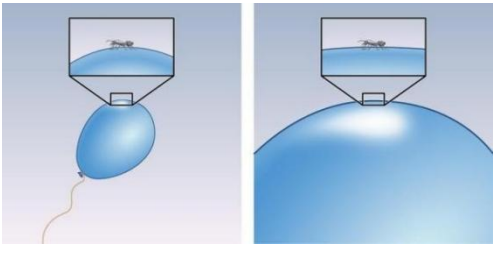

২. এক মেরুর সমস্যার সমাধান : ইনফ্লেশন হওয়ার ফলে যেসব একক মেরুর (মনোপোল) অস্তিত্ব প্রাথমিক অবস্থায় ছিল সেগুলোর ঘনত্ব হুট করে হ্রাস পায়। এতটাই হ্রাস পায় যে মনোপোলের শনাক্তকরণ খুবই রুহ হয়ে গিয়েছে। এ কারণে মনোপোলের সন্ধান আমরা পাই না।

৩. দিগন্ত সমস্যার সমাধান : ইনফ্লেশন প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্ব প্রসারণ মূলত সূচকীয় হারে মুহূর্তের মাঝেই বেড়ে গিয়েছিলো। যে কারণে যে দুইটি অঞ্চল এখন বহু বহু দূরে অবস্থান করছে তারা ইনফ্লেশন এর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বলতে গেলে প্রায় একই জায়গায়, একটি সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করছিলো। অন্যকথায় ইনফ্লেশনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাদের একে অপরের সংস্পর্শে আসার প্রবণতা বেশি ছিলো। অর্থাৎ তাদের মাঝে একটি আপাত-সংযোগ ছিল। আর CMB-এর তাপমাত্রাসমস্যার সমাধান এখানেই লুকিয়ে আছে। ওই সংযোগ থাকার ফলে তাদের তাপমাত্রা পুরোপুরি একই না হলেও প্রায় একই ছিল। হয়তো সামান্য পার্থক্য ছিল। কিন্তু যখনই ইনফ্লেশন হলো তখনই এই অঞ্চলগুলো আলাদা হয়ে গেল প্রচণ্ডগতিতে। তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। কিন্তু পূর্বমুহূর্তে তারা প্রায় তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকার কারণে আজও তাদের সেই তাপমাত্রার হেরফের খুব একটা লক্ষ করা যায় না। মহাবিশ্বে যেদিকেই তাকানো হোক না কেন এই তাপমাত্রা প্রায় একই। এ তাপমাত্রা বর্তমানে প্রায় পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি। CMB পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় এই বিকিরণের গড় তাপমাত্রা 2.725 কেলভিনের খুব কাছাকাছি। পরমশূন্য তাপমাত্রা বলতে 0 কেলভিন বোঝায়। (-273.15 ডিগ্রি সেলসিয়াস) 0 কেলভিনের নিচে আর কোনো তাপমাত্রার অস্তিত্ব নেই।

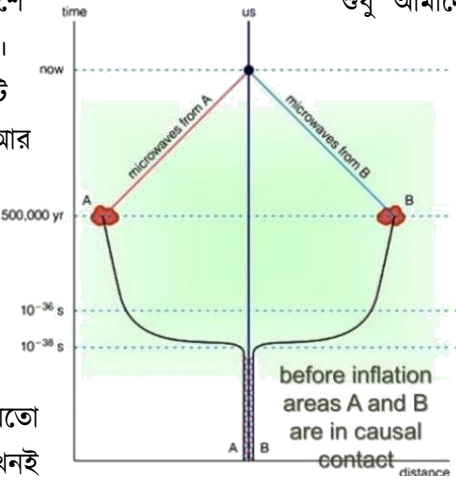

ইনফ্লেশন তত্ত্ব এই সব প্রশ্নের উত্তর যেমন দিয়েছিল তেমনই একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিল। সেটা হলো অসংখ্য মহাবিশ্বের সম্ভাবনা।

শুধু আমাদের ইউনিভার্সই নয়, রয়েছে আরও অসংখ্য ইউনিভার্স। এদিকে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ শন ক্যারল দেখান যে একদম শূন্য থেকে অসংখ্য মহাবিশ্বের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব কিছু না। আমরা যে শূন্যস্থান দেখি সেটা প্রকৃতপক্ষে শূন্য নয়। শূন্যতার মাঝে অনবরত চলছে কণা-প্রতিকণা সৃষ্টি ও ধ্বংস। শূন্যস্থানের এই কোয়ান্টাম আলোড়নের ফলেই সৃষ্টি হতে পারে বিভিন্ন ধরনের বাবল/বুদবুদ। এই বুদবুদ আসলে স্থান-কালের বুদবুদ। আমাদের মহাবিশ্ব যেমন একটি বুদবুদ থেকে সৃষ্ট তেমনি অন্যান্য বুদবুদ সৃষ্টি হওয়া তো অসম্ভব নয়। যদি এমন হয় তাহলে তো সেগুলো প্রসারনের মাধ্যমেও অসংখ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে! অ্যালান গুথও তার তত্ত্ব থেকে বলেছিলেন মাল্টিভার্স থাকার সম্ভাবনার কথা।

ইনফ্লেশন হওয়ার কারণ এখন পর্যন্ত কিন্তু ঠিকভাবে জানা যায়নি। সবই অনুমাননির্ভর ধারণামাত্র। তবে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ যে অনুমানটি এখন পর্যন্ত করা হয়েছে তার মধ্যে আছে সবল নিউক্লিয়বলভিত্তিক অনুমান। ইনফ্লেশনের ওই পর্যায়ে হয়তো সবল নিউক্লিয়বল অন্যান্য মৌলিক বল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। (এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হওয়া মৌলিক বল চারটি : সবল নিউক্লিয়বল, দুর্বল নিউক্লিয়বল, মহাকর্ষ বল, তাড়িৎচৌম্বক বল)। আলাদা হওয়ার ফলে সেসময়ের মহাবিশ্ব একটি অস্থায়ী অবস্থায় পতিত হয়েছিল। এই অস্থায়ী অবস্থা থেকে স্থায়ী অবস্থায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয় তীব্র মহাকর্ষবিরোধী প্রভাব। যার ফলে মুহূর্তের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে কণা তৈরি হয়ে এই ইনফ্লেশনকে ঘটিয়েছে। এছাড়া এসময় কোয়ান্টাম আলোড়নের মাধ্যমে মাল্টিভার্সের সম্ভাবনাও আছে। এই অনুমান অনুসারে বর্তমানে গ্যালাক্সি-ক্লাস্টারগুলোর একদম আদিমতম অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। তবে বিজ্ঞান তো আর অনুমান করেই বসে থাকতে পারে না। সে চায় প্রমাণ। ইনফ্লেশন আসলেই হয়েছিল কিনা সেই প্রমাণ খোঁজার জন্য 1992 সালে কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার (COBE) কাজ শুরু করে। CMB-এর বিকিরণ পরীক্ষা করে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ইনফ্লেশনের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়া 2003 সালে WMAP-এর (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) বিশ্লেষণ, 2014 সালে CMB এবং মহাকর্ষীয়তরঙ্গের সম্মিলিত প্রভাব শনাক্তকরণ-- এসব থেকে ইনফ্লেশনের পক্ষে একটি জোরালো প্রমাণ উপস্থাপিত হয়।

তবে এত সাফল্য থাকা সত্ত্বেও ইনফ্লেশনের কিছু ব্যর্থতা আছে। গুথ নিজেই তা স্বীকার করেছেন। ইনফ্লেশন হলেও পরবর্তীতে কীভাবে ছায়াপথগুলো সৃষ্টি হলো কিংবা কীভাবে আসলো তারকারাজি তা ইনফ্লেশন ব্যাখ্যা করতে পারে না। গুথের মডেলকে পুরাতন হিসেবে আখ্যা দিয়ে পরবর্তীতে 1982 সালে অ্যান্দ্রেই দিমিত্রিয়েভিচ লিন্দে নতুন একটি ইনফ্লেশন মডেলের অবতারণা করেন। এই মডেলটি অ্যালান গুথের মডেলের সাথে অনেকাংশেই সমর্থনযোগ্য ছিল। এই নতুন মডেলে অসংখ্য মহাবিশ্বের ধারণা আরও পাকাপোক্ত অবস্থানে চলে আসে। 1983 সালে ইনফ্লেশনের শেষ পর্যায়ে কীভাবে ছায়াপথগুলোর জন্ম হয়েছিল তার ব্যাখ্যা করেছিলেন জেমস বার্ডিন, মিখায়েল এস টার্নার এবং স্টেইনহার্ড।

এভাবে পরবর্তীতে ইনফ্লেশনের আরও কিছু জটিল সমালোচনা সামনে চলে আসে। তবে বেশ কিছু পর্যবেক্ষণকৃত ডাটার সাথে অনুমাননির্ভর কথাগুলো মিলে যাওয়ার কারণে ইনফ্লেশনের ধারণাকে সরাসরি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। আবার একদম নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করারও সুযোগ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের মহাবিশ্বের সৌন্দর্য বোঝার জন্য এসব তো জানতেই পারি। চোখ থাকুক ভবিষ্যতের দিকে।

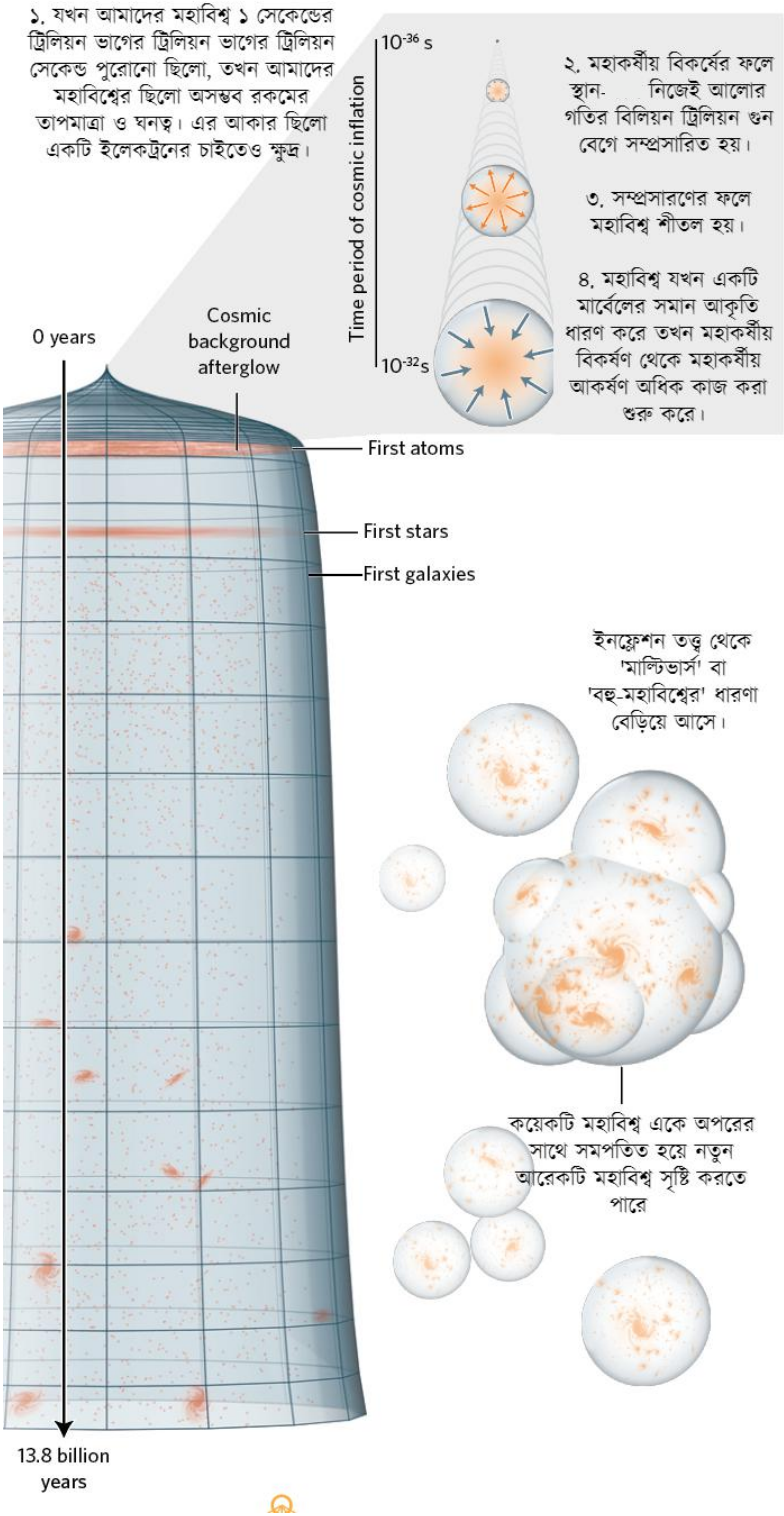
১. যখন আমাদের মহাবিশ্ব ১ সেকেন্ডের ট্রিলিয়ন ভাগের ট্রিলিয়ন ভাগের ট্রিলিয়ন সেকেন্ড পুরোনো ছিলো, তখন আমাদের মহাবিশ্বের ছিলো অসম্ভব রকমের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব। এর আকার ছিলো একটি ইলেকট্রনের চাইতেও ক্ষুদ্র।
Time period of cosmic inflation
10^{-36} s
10^{-32}s
২. মহাকর্ষীয় বিকর্ষের ফলে স্থান- নিজেই আলোর গতির বিলিয়ন ট্রিলিয়ন গুন বেগে সম্প্রসারিত হয়।
৩. সম্প্রসারণের ফলে মহাবিশ্ব শীতল হয়।
৪. মহাবিশ্ব যখন একটি মার্বেলের সমান আকৃতি ধারণ করে তখন মহাকর্ষীয় বিকর্ষণ থেকে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ অধিক কাজ করা শুরু করে।
0 years
Cosmic background afterglow
First atoms
First stars
First galaxies
13.8 billion years
ইনফ্লেশন তত্ত্ব থেকে 'মাল্টিভার্স' বা 'বহু-মহাবিশ্বের' ধারণা বেড়িয়ে আসে।
কয়েকটি মহাবিশ্ব একে অপরের সাথে সমপতিত হয়ে নতুন আরেকটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারে

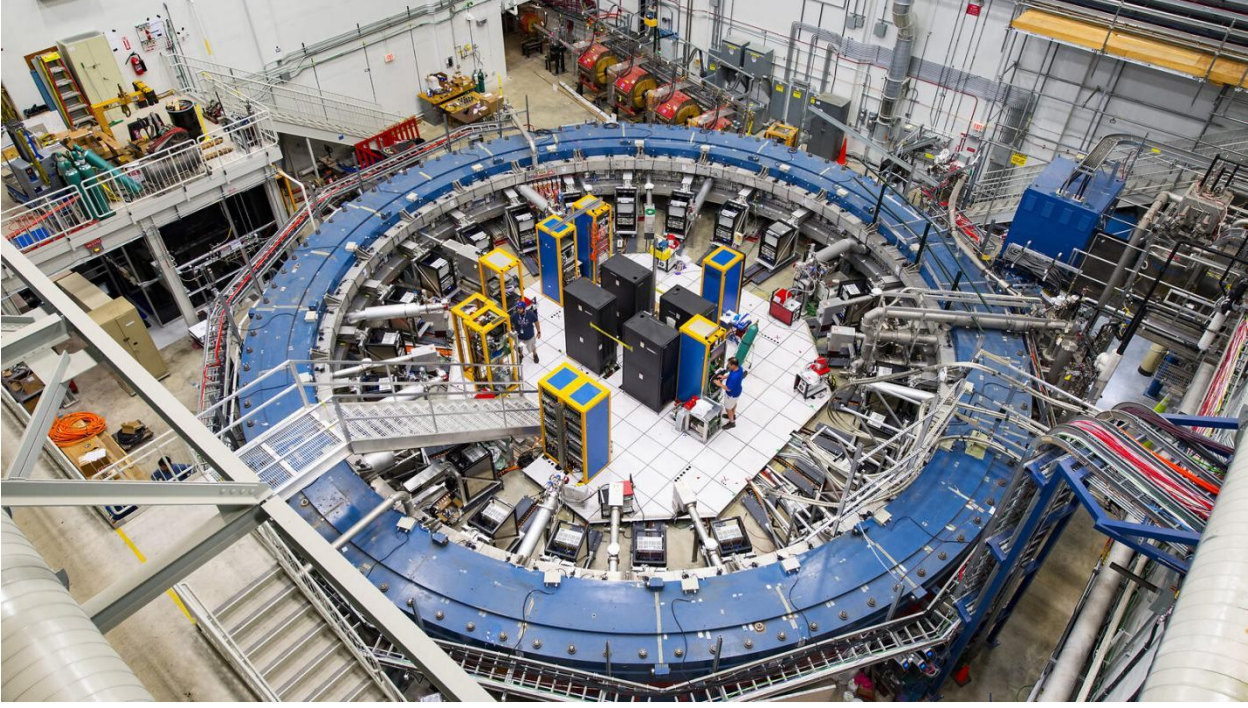

মিউয়ন জি মাইনাস টু

আশরাফুল ইসলাম মাহি

স্ট্যান্ডার্ড মডেল অব ফিজিক্স, পদার্থবিজ্ঞানের একটা তত্ত্ব। আরও এক্সাক্টলি বলতে গেলে আসলে পার্টিকেল ফিজিক্সের ভিত্তি। পুরো মহাবিশ্বের সবকিছুই আসলে ছোটো-ছোটো কণা বা পার্টিকেল দিয়ে তৈরি। পার্টিকেলগুলোর কে কার সাথে কী আচরণ করবে, সবই এই স্ট্যান্ডার্ড মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা গিয়েছে। 'গিয়েছে কেন?', 'যায়' না কেন? স্ট্যান্ডার্ড মডেল আসলে নিজেই পরিপূর্ণ না। আপডেট হবে। নতুন কণা আবিষ্কার হবে। শেষে হয়তো একরকম পূর্ণতা পাবে। যারা মোটামুটি পার্টিকেল ফিজিক্স বা কণা পদার্থবিজ্ঞানকে চেনেন, তারা নিশ্চই এই মডেল সম্পর্কে একটু-আধটু ধারণা রাখেন।

স্ট্যান্ডার্ড মডেলে আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সবগুলো মৌলিক কণা আছে। এদের একভাগ ফার্মিওন, আরেকভাগ বোজন। কোনটি বোজন আর কোনটি ফার্মিওন তা ভাগ করা হয় পার্টিকেলের স্পিন হিসেবে। স্পিন মানে কিন্তু আবার নিজ অক্ষের উপর ঘোরা বুঝায় না। এদের জগতে স্পিন মানে আসলে পার্টিকেলের নিজস্ব

একটা বৈশিষ্ট্য, কৌণিক ভরবেগের মতো ধরতে পারেন। এই স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার যখন ভগ্নাংশ হয়, তখন সেই কণাকে বলা হয় ফার্মিওন। আর স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার যখন পূর্ণসংখ্যা হয় তখন সেটা বোজন।

আমাদের জগতের সব বস্তুই এই ফার্মিওনের তৈরি। আর বোজন হচ্ছে বলবহনকারী। আলোর কণা বোজন, ইলেকট্রন হচ্ছে ফার্মিওন। মহাবিশ্বের সবগুলো মৌলিক বলের জন্যই এই স্ট্যান্ডার্ড মডেল বোজন রাখে। বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলের জন্য ফোটন, সবল বলের জন্য গ্লুয়ন, দুর্বল বলের জন্য W বা Z বোজন, আর একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি। মজার ব্যাপার হলো স্ট্যান্ডার্ড মডেল গ্র্যাভিটিকে নিয়ে ডিল করতে পারে না। তবুও গ্র্যাভিটি জন্য গ্র্যাভিটন নামক কণা প্রস্তাব করে রাখা হয়েছে। যেদিন গ্র্যাভিটন আবিষ্কার হবে, সেদিন বাকিটা দেখা যাবে। এই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের মোটামুটি বেসিক।

এত কথা কেন বললাম?

আমাদের এই আর্টিকেলটা আসলে মিউওন নামক একটা কণার একটা মজার পরীক্ষার ওপর। বুঝতেই পারছো, মিউওন হচ্ছে ফার্মিওন কণা, এর নাম বোজনের তালিকায় নেই বলে। এই ফার্মিওন কণা মিউওন এমন কী করলো, সেটা জানার আগে আগে জানতে হবে যে এই মিউওন কেমন কণা। কে এ?

২.

মিউওন কে?

মিউওন হচ্ছে একটা মৌলিক কণা। ইলেকট্রনের চেয়ে 207 গুণ ভারী, চার্জ ইলেক্ট্রনের চার্জের সমান, লাইফটাইম খুব কম, মাত্র $2.19703(4) \times 10^{-6}$ সেকেন্ড! এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলতেই হয়। এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে সংখ্যাটা, 4, এমন লেখার একটা কারণ আছে। এরকম লেখা হয় তখন, যখন একটা সংখ্যা নিয়ে কনফিউশান থাকে। মোটামুটি নিশ্চিত না হওয়ায় এখানে 4 কে একদম চূড়ান্ত ধরা হয়নি।

মিউওনকে ইলেকট্রনের ছোটোবেলায় মেলায় হারিয়ে যাওয়া জমজ ভাই হিসেবে বলা যায়, অনেক কিছুই এদের একইরকম। স্পিন পর্যন্ত ½ , ইলেকট্রনের সমান।

আমাদের পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে সূর্য আর অন্যান্য মহাজাগতিক কণাগুলো প্রচণ্ডশক্তি নিয়ে বায়ুমণ্ডলে আঘাত করছে। সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে অহরহ মিউওন। এই মিউওনগুলো ধেয়ে এসে ভূ-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ছে, প্রতিমুহূর্তে আপনার চোখের সমান জায়াগা দিয়ে লাখ লাখ মিউওন যাচ্ছে। কল্পনা করুন তো একবার, আপনার সামনে মিউওনের বন্যা বইয়ে যাচ্ছে, অথচ একটাকেও দেখতে পাচ্ছেন না!

৩.

মিউওনের চার্জ আছে। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে ইন্টারাক্ট করে। যে-কোনো চার্জবিশিষ্ট কণাকে যখন শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে আনা হয়, তখন তারা ঘুরতে থাকে, কেন ঘুরবে?

চার্জ আর স্পিনের জন্য এদের চুম্বক মেরু আছে। প্রত্যেকটা যেন এক একটা ক্ষুদ্র দণ্ডচুম্বক। এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কণাগুলো দণ্ডচুম্বকের

Standard Model of Elementary Particles
three generations of matter (elementary fermions)
three generations of antimatter (elementary antifermions)
interactions / force carriers (elementary bosons)
I
II
III
I
II
III
mass
charge
spin
QUARKS
LEPTONS
GAUGE BOSONS
VECTOR BOSONS
SCALAR BOSONS
≃2.2 MeV/c² ⅔ ½ u up
≃1.28 GeV/c² ⅔ ½ c charm
≃173.1 GeV/c² ⅔ ½ t top
≃2.2 MeV/c² −⅔ ½ ū antiup
≃1.28 GeV/c² −⅔ ½ c̄ anticharm
≃173.1 GeV/c² −⅔ ½ t̄ antitop
0 0 1 g gluon
≃124.97 GeV/c² 0 0 H higgs
≃4.7 MeV/c² −⅓ ½ d down
≃96 MeV/c² −⅓ ½ s strange
≃4.18 GeV/c² −⅓ ½ b bottom
≃4.7 MeV/c² ⅓ ½ d̄ antidown
≃96 MeV/c² ⅓ ½ s̄ antistrange
≃4.18 GeV/c² ⅓ ½ b̄ antibottom
0 0 1 γ photon
≃0.511 MeV/c² −1 ½ e electron
≃105.66 MeV/c² −1 ½ μ muon
≃1.7768 GeV/c² −1 ½ τ tau
≃0.511 MeV/c² 1 ½ e⁺ positron
≃105.66 MeV/c² 1 ½ μ̄ antimuon
≃1.7768 GeV/c² 1 ½ τ̄ antitau
≃91.19 GeV/c² 0 1 Z Z⁰ boson
<2.2 eV/c² 0 ½ νe electron neutrino
<0.17 MeV/c² 0 ½ νμ muon neutrino
<18.2 MeV/c² 0 ½ ντ tau neutrino
<2.2 eV/c² 0 ½ ν̄e electron antineutrino
<0.17 MeV/c² 0 ½ ν̄μ muon antineutrino
<18.2 MeV/c² 0 ½ ν̄τ tau antineutrino
≃80.39 GeV/c² 1 1 W⁺ W⁺ boson
≃80.39 GeV/c² −1 1 W⁻ W⁻ boson

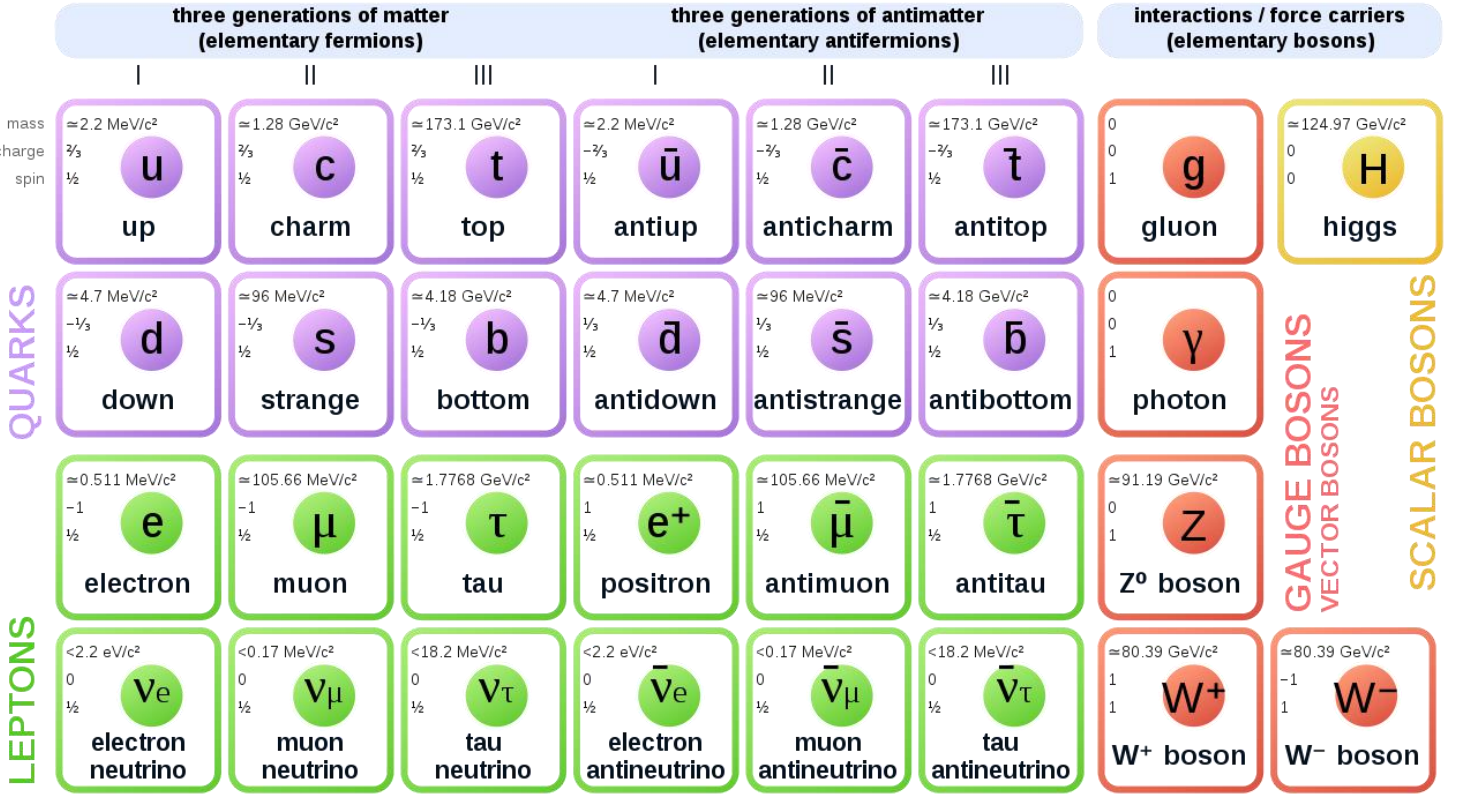

মতো আচরণ করবে, এটাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক মোমেন্ট। এই ঘোরার ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ করেন স্টার্ন ও গারলাখ, 1922 সালে। চৌম্বকক্ষেত্রে ইলেকট্রন চালিয়ে দেখেন যে ইলেকট্রনগুলো সব নিজে থেকেই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারটা থেকেই স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার আবিষ্কার হয়।

আগে পদার্থবিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলোকে যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আনা হবে, তখন সত্যিকারের দণ্ডচুম্বকের মতোই ঘুরবে। যে যতবেশি ঘুরবে, তার চৌম্বকত্ব তত বেশি শক্তিশালী।

কিন্তু পরে দেখা যায় যে আসলে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এই ঘোরার পরিমাণটা দ্বিগুণ। বাস্তব বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি ঘোরে এই পিচ্চি কণাগুলো। এই যে ঘোরাঘুরির অনুপাত বা তুলনা, সেটাকে বলা হয় Gyromagnetic Ratio বা 'g Factor'। এই অনুপাতের সাংখ্যিক মানের আগে কণার চার্জ যে চিহ্নের, সেটা বসিয়ে দিয়ে জি ফ্যাক্টর প্রকাশ করা হয়।

মিউওন আর ইলেক্ট্রনের জি ফ্যাক্টর প্রথম তাত্ত্বিকভাবে বের করেন হচ্ছে পল ডিরাক, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এক মহানায়ক। উনি 1928 সালে মিউওনের আর ইলেকট্রনের জি ফ্যাক্টর নির্ণয় করেন 2 (আসলে এখানে 2 এর আগে মাইনাস হতো। কিন্তু আমরা সুবিধার জন্য মাইনাসটা সরিয়ে রাখব)। আসলে চার্জ আর স্পিন একই হওয়ায় এদের জি ফ্যাক্টরও একই এসেছে। কিন্তু বাধ সাধে আরও খানিক বছর পরে।

1947 সালে হেনরি ফোলি ইলেকট্রনের জি ফ্যাক্টর আরও সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করেন। উনি হিসাবে পান 2.00232। এটা এক্সপেরিমেন্টাল ছিল। তাই কুনজর গেল তত্ত্বের উপর। তত্ত্বে গরবর মনে হচ্ছে। কিন্তু না, সাথেসাথেই জবাবও আসলো যে কেন এমন হয়। বিজ্ঞানী জুলিয়ান সুইঙ্গার ব্যাখ্যা দিলেন যে এটা আসলে ইলেকট্রনের ফোটন শোষণ করা আবার বিকিরণ করার জন্য। শূন্যস্থানেও শক্তি লুকিয়ে থাকে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশান হয়ে শূন্য থেকেই কণা-প্রতিকণা তৈরি হয়। এইগুলো আবার মাত্রাতিরিক্ত হালকা প্লাস কম-জীবনকালের হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে এগুলোই ইলেকট্রনকে ধাক্কা দিয়ে একটু বেশি ঘুরিয়ে দিচ্ছিল। ইলেকট্রন নিজেও অনেক হালকা, তাই বেশ প্রভাব ফেলছিল এই ফ্লাকচুয়েশান। তবে পরবর্তীতে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স দিয়ে জটিল প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনের জি ফ্যাক্টর নির্ণয় করা হয়, 2.00231930436256(35) আর এটাই আজ পর্যন্ত সবচেয়ে নিখুঁত মান, ইলেকট্রনের জন্য।

মজার ব্যাপার হলো জি ফ্যাক্টরের দশমিকের পরের মানগুলো যে অংশটা তাত্ত্বিক মানের সাথে মিলে না, সেগুলো কিন্তু আলাদা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করে। কীভাবে?

ধরো, একটা সাইকেল চলবে সর্বনিম্ন 5 মি/সে বেগে। তাত্ত্বিকভাবে বের করেছ যে হ্যাঁ, এই 5

মি/সে বেগেই চলবে। কিন্তু পরীক্ষা করার সময় দেখলেন যে না, 5.0003 মি/সে বেগে চলছে। এখন আপনি কী বলবেন, এই অতিরিক্ত (5.0003 – 5) = 0.0003, এইটা কেন এলো?

তখন হয়তো বলবেন যে হ্যাঁ, বাতাস পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছিল, তাই হয়েছে। তো এবার আপনি এবার বাতাসের ধাক্কা পরীক্ষা করার মেশিন পিঠে নিয়ে সাইকেল চালাচ্ছেন। আবারও একই, সাইকেলের বেগ 5.0003। তবে এবার আপনার কাছে একটা অতিরিক্ত তথ্য আছে। সেটা হচ্ছে বাতাসের ধাক্কার পরিমাণ। মেশিনে দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে 0.0002 । আপনি যোগ করলেন। তারপর হিসেব করলেন যে আর কতটুকু হিসাবের সাথে মিলছে না (5.0003 – 5.0002) = 0.0001 ।

ভারী মুশকিল! আপনি আর কোন প্রভাবককে আনবেন! অনেক কষ্ট করে চিন্তা করে বের করলেন যে সূর্যের আলোর জন্য যদি হয়! এবার হিসেব করে গরমিল পেলেন 0.00005 । এবার আরও মাথা খারাপ! কী এ হচ্ছে!

এবার অনেক চিন্তা করে একটা বুদ্ধিজীবী কমিটি বানিয়ে সেখান থেকে আর কী কী জানা জিনিস সাইকেলকে ধাক্কা দিতে পারে সব খুঁজে বের করলেন। সবগুলোর একদম নিখুঁত মান যতটা পারা যায় নিয়ে ভিতরে দিলেন। তাও গরমিল! 0.000000000003 মি/সে বেগ গরমিল এখনো রয়েই গেছে!

আপনি তাহলে কী বলবেন? পরীক্ষায় ত্রুটি? যদি পরীক্ষায় ত্রুটি না হয় তবে? বা হিসাবে ভুল? নিশ্চয়ই কোনো প্রভাবক বাদ পড়ে যাচ্ছে। অজানা, অচেনা কিছু। কোনো বল নয় তো? মিউওনের ক্ষেত্রেও কি তাই ঘটেছে?

৪.

মিউওনের জি ফ্যাক্টর তাত্ত্বিকভাবে সবগুলো জানা ফ্লাকচুয়েশান যোগ করেও পরীক্ষায় পাওয়া পরিমাণের সাথে মিলানো যাচ্ছিল না। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সব কণা এবং অন্যান্য হ্যাড্রনের জন্য মিউওনের জি ফ্যাক্টর হবার কথা ছিল 2.002331836(20) । একদম সুক্ষ্ম হিসাব।

মিউওনের ম্যাগনেটিক মোমেন্টকে নিয়ে সেই 1950 সাল থেকেই পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব পরীক্ষানিরীক্ষা বিশ্বের বড়ো-বড়ো সব বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগারে হয়ে আসছে। 1990 সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ব্রুকহেভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি 15 মিটার ব্যাসের একটা ম্যাগনেটিক রিং দিয়ে মিউয়নের উপর গবেষণা শুরু করে। এই রিং-এর ভেতরে মিউওনদের উপর চালানো হয় -267°C তাপমাত্রায়। সেখানে ঘুরতে থাকে তারা। ডাটা সংগ্রহ করে বের করা হয় জি ফ্যাক্টর।

দীর্ঘ দশ বছর পরিশ্রমের পর সাফল্য পান গবেষকরা। 2001 সালে মিউওনের জি ফ্যাক্টর পাওয়া যায় 2.0023318404, তাত্ত্বিক মানের একদম কাছে, দশমিকের পর 7 ঘর মিল! পরে

আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার শেষে 2006 সালে সর্বশেষ রিপোর্টে মান ছিল 2.003318416(13) । এটা আবার তাত্ত্বিক মানের আরও কাছাকাছি, দশমিকের পর আট ঘর অবধি মিল!

আর এই থিওরি ও পরীক্ষার সাথে অমিল অংশটুকুর কথা বুঝাতেই বলা হয় $(g - 2)$ (মানে জি মাইনাস টু), 2 হচ্ছে মিউওনের সত্যিকারের জি ফ্যাক্টর, যেখানে মিউওন বাদে আর কারও হাত নেই। আর g হচ্ছে সকল প্রকার বাহ্যিক বল হিসাব করে পাওয়া 2 এর চেয়ে একটু বেশি মান, আর এটাই মূল জি ফ্যাক্টর। $g - 2$ আসলে এই গরমিলের পরিমাণটুকুই বলে দেয়। এই গরমিল অংশের গরমিলে দায়ী করা সবকিছুকে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। তাও গরমিল যাচ্ছে না।

কিন্তু এত এত সূক্ষ্ম গবেষণার পরও বিজ্ঞানীরা বলেছেন এটুকু যথেষ্ট না! আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রয়োজন। এর কারণ হচ্ছে সিগমা।

৫.

প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্ট সে আপনার গোরুপালন হোক আর বম্ব-টেস্ট, সবকিছুতেই বাইরের কিছু না কিছু প্রভাবক ঝামেলা করে। এই ধরেন, গোরুকে নিয়মিত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘাস খাইয়ে এক মাস পরে দেখতে চাইলেন কী হয়। ধরেন প্রতিদিন 5 কেজি ঘাস খায়, কথার কথা। আমি আদৌ গোরু বিশেষজ্ঞ বা সে-রকম কেউ না, তাই জানিও না।

তো আপনি 5 কেজি মাপলেন। যে মেশিনে মাপলেন সেটার মাঝে ত্রুটি আছে সামান্য হলেও। আবার মাঝে মাঝে আপনার আদরের গোরুর জন্য একটু পক্ষপাতী ভাব নিয়ে একটু ঘাস বেশিই দিলেন।

গোরু সব ঘাস খেলো না। কিছুটা আশেপাশে পড়ে গেল। যে পাত্রে ঘাস দিচ্ছেন সেটা একটু বেশি নাড়াচাড়া করে, ঘাস পড়ে যায়। হ্যানত্যান, হাবিজাবি। আপনি গোবর, গোমূত্র — এগুলো যেগুলো গোরুর শরীর থেকে বের হয়ে যায়, সবগুলোর ওজনই মেপে রাখেন। লক্ষ্য হলো গোরুর ওজন কত কেজি বাড়বে সেটা দেখা। ধরেন প্রতিদিন গোরু খায় 5 কেজি, বের করে 4 কেজি। বাড়ল 1 কেজি। ত্রিশদিনে 30 কেজি। কিন্তু ত্রিশদিন পর দেখলেন যে না, 30 কেজি বাড়েনি। বেড়েছে 25 কেজি। আপনি এই এক্সপেরিমেন্ট আবার করলেন। কয়েকবার করার পরও একই ফলাফল পাচ্ছেন।

এখানে আপনার ডাটা সংগ্রহে ত্রুটি আছে। আপনি যতবার এই এক্সপেরিমেন্ট করে ডাটা সংগ্রহ করবেন, ভুলের পরিমাণ তত কমবে। এতগুলো ডাটা একটা সেটে ফেলে গড় মান বের করা যায়। পরিসংখ্যানে এভাবে ডাটার বিশ্বাসযোগ্যতা বা নির্ভুলতা নির্ণয় একটি সম্ভাবনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। একে বলে সিগমা (σ)।

বিজ্ঞানের কোনো এক্সপেরিমেন্ট থেকে আসা ডাটার সাথে থিওরেটিক্যালি পাওয়া ডাটার ফারাক কতটুকু, সেটা প্রকাশ করা হয় সিগমার

মাধ্যমে। পদার্থবিজ্ঞানের যে-কোনো এক্সপেরিমেন্টেই প্রচুর ডাটা সংগ্রহ করা হয়। যতটা পারা যায়। এদের মাঝে একটু-আধটু কমবেশি থাকেই। নিচের গ্রাফ লক্ষ করুন।

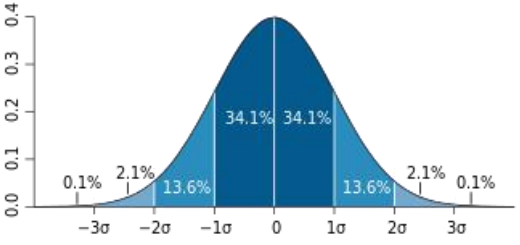

এখানে 0 এর যত কাছাকাছি হবে, ভুলের সম্ভাবনা তত কম। থিওরির সাথে এক্সপেরিমেন্টের মিল বাড়বে। আবার 0 থেকে যত সরে যেতে থাকবে, থিওরির সাথে এক্সপেরিমেন্টের মানের পার্থক্য বাড়তে থাকবে।

তো 2001 সালে ব্রুকহেভেনের এক্সপেরিমেন্টে আসলে 3.7 সিগমা পার্থক্য পাওয়া যায়। পরে 2006 সালে সিগমা পার্থক্য নেমে হয় সিগমা 2, আরেকটু নির্ভুল মান। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, থিওরির সাথে থাকা ফারাকটা কেন যেন মিলছেই না! সবগুলো জানা ফ্লাকচুয়েশান যোগ করার পরও এক্সপেরিমেন্টে মান বেশিই আসছে, যেটা অনাকাঙ্ক্ষিত।

ব্রুকহেভেনের এক্সপেরিমেন্ট আবার করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রেরই ফার্মিল্যাব টিম মিউওনের শক্তিশালী সোর্স তৈরি করে। চলতে থাকে গবেষণা।

৬.

2013 সাল। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ের ফার্মিল্যাবে আছে শক্তিশালী মিউওন বিম। মিউওনের ভালো সোর্স।

উচ্চশক্তির প্রোটন একটা টার্গেটে আঘাত করে পাইওন কণা বের করে। এই পাইওন কণাগুলোকে আবার একটা বৃত্তাকার চেম্বারে ঘোরানো হয়। পাইওন ক্ষয় হয়ে মিউওন তৈরি করে। এই মিউওনকে আলাদা করে নিয়ে আমাদের ওই ম্যাগনেটিক রিং-এ ঘোরানো হয়। যেটা মূল এক্সপেরিমেন্ট।

ব্রুকহেভেন টিমের কাছে শক্তিশালী ম্যাগনেটিক রিং থাকলেও ভালো মিউয়ন সোর্স ছিল না। আবার এদিকে ফার্মিল্যাব রিং বানানোর চেয়ে বরং ব্রুকহেভেনের রিংটাই নিয়ে আসে।

এই আট বছর ধরে ফার্মিল্যাবে গবেষণা চলছে। সব মিলিয়ে প্রায় 200 জনেরও বেশি পদার্থবিজ্ঞানী ফার্মিল্যাবের এই এক্সপেরিমেন্টের সাথে জড়িত। অবশেষে এবছরের (2021) 25 ফেব্রুয়ারি ফার্মিল্যাবের এক্সপেরিমেন্টে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের 132 জন পদার্থবিজ্ঞানীর একটি টিম ডাটা সংগ্রহ করে। এক্সপেরিমেন্টের ফল প্রকাশিত হয় 7 এপ্রিল। জানা সকল ফ্লাকচুয়েশান হিসাবে এনে পাওয়া যায় জি ফ্যাক্টর 2.0023318408(11) ।

এরপর আগেরগুলোর সাথে মিলিয়ে পাওয়া যায় 2.00233184121(82)। এক্সপেরিমেন্টে 4.2 সিগমা পাওয়া যায়।

ব্রুকহেভেন আর ফার্মিল্যাবের ফলাফল গ্রাফে দেখালে হয় স্ট্যান্ডার্ড মডেলের থেকে আসা তাত্ত্বিক মান থেকে 4.2 সিগমা পার্থক্য এই এক্সপেরিমেন্টের। তবে কণাপদার্থবিজ্ঞানীরা যে-কোনো নতুন আবিষ্কারের জন্য 5 সিগমা চান। সবচেয়ে সূক্ষ্ম মান। 5 সিগমা আসলে এক্সপেরিমেন্টে ভুলের পরিমাণ একদমই সামান্য, 35 লাখে 1 বার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। তারা আশা করছেন তা শীঘ্রই পেয়ে যাবেন। ফার্মিল্যাবে এই এক্সপেরিমেন্ট 2022 সাল পর্যন্ত চলবে। পরবর্তীতে আরও এক্সপেরিমেন্ট চালানোর পরিকল্পনা আছে। বহুল আকাঙ্ক্ষিত 5 সিগমা-ই এখন মূল টার্গেট।

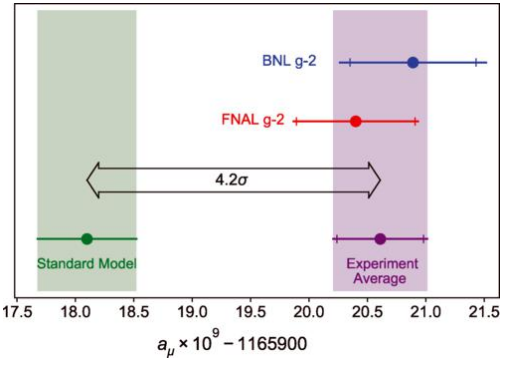

৭.

5 সিগমা পেলে কী হবে?

অনেককিছু। 5 সিগমাতেও থিওরেটিক্যাল মান যেটা, সেটার সাথে পার্থক্য বেশি হলে সম্ভাবনা আছে একটা নতুন বল আবিষ্কারের। নতুন কণা। পদার্থবিজ্ঞানের জগতে পঞ্চম বলের সন্ধান। আগের সাইকেলের বেগের মতো, হিসাব না মেলার কারণ হিসেবে নতুন অজানা বলের খোঁজ।

বল মানেই সাথে একটা নতুন কণা। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে নতুন সদস্যের আগমণ। শুভেচ্ছা তোমায় পঞ্চম বল। তোমার অস্তিত্ব আসলেই আছে, নাকি এটা মানুষের ভ্রম?

ডাটা সায়েন্সে হাতেখড়ি

পর্ব ১

আজমাইন তৌসিক ওয়াসি

একাবিংশ শতাব্দীর চাবিকাঠি হলো তথ্য, ডেটা, ইনফরমেশন। আমরা যেখানেই যাই সেখানেই নানারকম তথ্যে ভরপুর। দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সবক্ষেত্রেই এখন ডেটার রাজত্ব। জীবনের প্রতিটি পদে পদেই তৈরি হচ্ছে নানা ইনফরমেশন। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? এক কাজ করি, মোবাইলে জিপিএস অন করে এক পা সামনে যাই, গুগল কি জানে এটা? জানে! প্রতি 3 সেকেন্ডে 6 মিলিমিটারের সরণও সে নিখুঁতভাবে মাপতে পারে। তাহলে, আমি মাত্র যে এক পা সামনে গেলাম, সেখানে কতগুলো ডেটা তৈরি হলো? আমার লোকেশন, আমি কোন দিকে তাকিয়ে আছি থেকে শুরু করে আমার ফোনের মডেল পর্যন্ত সব! তাহলে? হ্যাঁ, জীবনের প্রতি পদে পদেই ডেটা!

ফেসবুক কীভাবে বুঝে যে কখন কোন এড আমাকে দেখানো দরকার? উত্তর হচ্ছে তার কাছে থাকা আমার ব্যাপারে তথ্য! গুগল কীভাবে বুঝে যে আমি কী খুঁজতে চাচ্ছি? উত্তর হচ্ছে তার কাছে থাকা আমার ব্যাপারে তথ্য! ইউটিউব কীভাবে বুঝে যে আমি এখন কোন ভিডিও

দেখতে চাই? উত্তর হচ্ছে তার কাছে থাকা আমার ব্যাপারে তথ্য! নেটফ্লিক্স কীভাবে বুঝে যে কখন আমার কোন সিরিজ বা মুভি দেখতে মন চাচ্ছে? উত্তর হচ্ছে তার কাছে থাকা আমার ব্যাপারে তথ্য!

প্রতিদিন মানুষ গড়ে কয় জিবি ডেটা তৈরি করে বলে মনে হয়? 100 টেরাবাইট? না কি আরো বেশি?

উহু! উত্তরটা হচ্ছে 2.5 কুইন্টিলিয়ান বাইট ডেটা বা 2.5×1000000000 জিবি (এক এরপর নয়টা শূন্য!)। এত্ত এত্ত ডেটা কেউ কোনো কাজ ছাড়া কেন সংরক্ষণ করে রাখবে? কেউই না। অবশ্যই এসব ডেটার অনেক বাস্তব প্রয়োগ আছে, আর সে-সবেরই সামনে পড়ছি আমরা প্রতিনিয়ত। ডেটার জালে আমরা সবাই বন্দি।

ডেটা সায়েন্স

ডেটা হচ্ছে কিছু তথ্য, সেটা অগোছালো হতে পারে, গোছালোও হতে পারে। কিন্তু, সে-সব থেকে কোনো কাজ বের করতে না পারলে সেই ডেটা মূল্যহীন। আর, ডেটা থেকে এই ভিতরের খবর খুঁজে বের করার কাজই হলো ডেটা সায়েন্স।

ডেটা সায়েন্স একটা অনেক বড় ও বিস্তৃত বিষয়। অনেকগুলো ছোটো ছোটো সেকশন বা পার্টে বিভক্ত, যাদের একটা পার্ট নিয়েই ১০-২০ টা বই অনায়াসে লেখা যাবে। বইয়ের ভাষায় বললে, ডেটা সায়েন্স হলো বিজ্ঞানের এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, অ্যালগরিদম ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিভিন্ন ডেটা সিস্টেম হতে নানারকম তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ডেটা থেকে নানারকম প্রয়োজনীয় লুকানো তথ্য, ইনসাইট বা সিদ্ধান্ত বের করা হয়, যা পরবর্তীতে গবেষণা বা ব্যাবসায়িক কাজে লাগানো হয়।

একটা উদাহরন দেই। মনে করুন, আমার কাছে অনেকগুলো কাঠ আছে। কিন্তু আমি যতক্ষণ না আমি সেই কাঠ ব্যবহার করে একটা বাড়ি বা বৃষ্টি থেকে বাঁচার মতো কিছু বানাব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিন্তু বৃষ্টি থেকে নিরাপদ নই। বৃষ্টি হলেই আমি ভিজে যাব। কাঠ আমার কাছে দামী। তাই আমার জন্য ভালো তখনই হবে যখন আমি কাঠগুলোকে কাজে লাগাব! কাঠ কাজে না লাগালে তা মূল্যহীন হয়ে যাবে ও আমার আর্থিক ক্ষতি হবে। একইরকমভাবে ডেটা কাজে না লাগলে সেটা মূল্যহীন হয়ে যাবে তো বটেই বরং আমার আরো ক্ষতি হবে। আর এই ডেটাকে কাজে লাগানোর কারিগর-ই হলো ডেটা সায়েন্টিস্ট।

ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে কী কী লাগবে?

ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে গেলে সবার আগে লাগবে আগ্রহ, লেগে থাকার ক্ষমতা। আরও লাগবে ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবং অ্যানালিইটিক্যাল স্কিল। এছাড়াও নানা অ্যালগরিদম ও টুলস ব্যবহারে সমানভাবে দক্ষ হতে হবে।

~ আগ্রহ, লেগে থাকার ক্ষমতা

ডেটা সায়েন্সের প্রতিটা স্টেপ বেশ সময়সাপেক্ষ ও ধৈর্যের ব্যাপার। ডেটা কালেকশন এর পর প্রি-প্রসেসিং, তারপর অ্যানালাইসিস, সব স্ট্যাটস - ইনফো চেক করা, বিভিন্ন টাইপের ডেটার মধ্যে সম্পর্ক খোঁজা, নানা প্লট-গ্রাফ তৈরি করে মডেলিং-এর প্ল্যান করা (এসব নিয়ে পরের পর্বগুলোতে বিস্তারিত থাকবে) - এগুলো অনেক ধৈর্যের কাজ। পিছু লেগে থাকার ক্ষমতা না থাকলে সামনে আগানো অনেক কঠিন।

~ ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবং অ্যানালিটিক্যাল স্কিল

ক্রিটিক্যাল থিংকিং বর্তমান যুগে অন্যতম প্রয়োজনীয় একটা স্কিল। বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে নানারকম কনসেপচুয়ালাইজেশন, নানারকম অ্যানালিটিক টুলসের ব্যবহার করে নির্দিষ্ট টপিকে একটা ডিসিশনে আসা এবং নিজেই সেই সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করতে পারার ক্ষমতাই হলো ক্রিটিক্যাল থিংকিং। অনেক ডেটা থেকে নিজের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা খোঁজা থেকে শুরু করে অনেক মেশিন লার্নিং মডেল থেকে শ্রেষ্ঠ মডেল বের করে এপ্লাই করা, মডেল টিউনিং করা - ডেটা সায়েন্সের প্রতিটা ধাপেই আছে ক্রিটিক্যাল থিংকিং। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটা আস্তে আস্তে আয়ত্ত করা যায় প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। আর পাশাপাশি অভিজ্ঞতার সাথে সাথে তো বাড়ছেই।

~ টুলস-ল্যাংগুয়েজ-সফটওয়্যার

ডেটা সায়েন্সের জন্য আরেকটি প্রয়োজনীয় জিনিস হলো টুলস। তোমার টুলসের ভান্ডার যত শক্তিশালী হবে, যত দক্ষভাবে এসব ব্যবহার করতে পারবে, তুমি তত ভালো ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে পারবে । বর্তমানে 'পাইথন' এবং 'আর' ল্যাংগুয়েজ বেশি ব্যবহৃত হয় ডেটা সায়েন্সে। পাইথনে ডেটা সায়েন্সের জন্য অনেক লাইব্রেরি আছে। যেমন, ডেটা প্রসেসিং-এর জন্য Numpy, Pandas; ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য Matplotlib, Plotly, Seaborn, ggplot, Altair; মেশিন লার্নিং এন্ড মডেলিং-এর জন্য Scikit-learn, Theano, TensorFlow, Keras, PyTorch ইত্যাদি। তবে প্রায় সব প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজেই এখন ডেটা সায়েন্স টুলস-মডিউল-প্যাকেজ আছে। পাশাপাশি Microsoft Excel, Power BI, Tableau এসব সফটওয়্যারেও পারদর্শিতা প্রয়োজন। সে নিয়ে আমরা আরেকদিন বিস্তারিত আলোচনা করব।

ডেটা অ্যানালাইসিস, ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং, না কি ডেটা সায়েন্স?

ডেটা নিয়ে এরকম অনেকগুলা টার্ম বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অনেকেই আবার তিনটাকে একসাথে গুলিয়ে ফেলে। তবে এ তিনটা টার্মের কাজ-বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারে বেশ পার্থক্য আছে।

ডেটা অ্যানালাইসিস

ডেটা অ্যানালাইসিস হলো, ডেটার ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্ত আনতে সাহায্য করা। তারা ডেটা কালেক্ট, প্রি-প্রসেসিং, হ্যান্ডেলিং, সয়োরেজ ম্যানেজমেন্ট, প্রাইমারি ভিজুয়ালাইজেশন করে থাকেন ও ডেটা সায়েন্টিস্টকে সহায়তা করেন। তাদের ডাটা অ্যানালিটিক প্রোগ্রামিং-এর পাশাপাশি টেকনিক্যাল স্কিল, বিশেষত BI (Business Intelligence) Tools যেমন : Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Tableau, SAS Visual-এর স্কিল বেশি প্রয়োজন হয়।

ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং

ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হলো, ডেটাকে ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতা। ডেটা ইঞ্জিনিয়ারদের ডেটা নিয়ে কাজ করার সম্পূর্ন টেকনিক্যাল স্কিল থাকে। তারা ডেটাকে নিজেদের/ডেটা সায়েন্টিস্টদের প্রয়োজন মতো ম্যানিপুলেট করতে পারে। তারা ডেটা পাইপলাইন ডিজাইন, ইমপ্লিমেন্ট ও অ্যাডমিনিস্ট্রেট করে থাকেন, প্রয়োজন মতো এপিআই (এপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস) তৈরি ও ইন্ট্রিগ্রেট করতে পারেন।

ডেটা সায়েন্স

ডেটা সায়েন্টিস্ট ডেটা সংক্রান্ত সবরকম স্ট্যাটিসটিকস, ডোমেইন নলেজ, অ্যানালাইজিং টুল, প্রোগ্রামিং ও মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমে মাস্টার এবং তিনি সবরকমের কমপ্লেক্স ডেটা প্রসেসিং ও অ্যানালাইসিস করে বিজনেস বা গবেষণা উপযোগী তথ্য বের করে আনতে পারেন।

বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনার রোগী শনাক্ত হয়। এরপর থেকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু করোনা রোগী শনাক্ত হচ্ছে। এইসকল ডেটা এনালাইসিস করে, গাণিতিক মডেল তৈরি করে পূর্ব থেকেই (কিছুটা ত্রুটিসহ) বলা সম্ভব কবে আবার করোনার ঢেউ আসবে। এসবই সম্ভব হয়েছে ডাটা সায়েন্সের বদৌলতে।

ডেটা সায়েন্স কাদের জন্য?

ডেটা সায়েন্সের জন্য গণিত অনেক অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তাই বলে, এটা শুধুমাত্র এই কয়েকটা বিষয়ের জন্য না। ডেটা সায়েন্সের জন্য গণিতের কিছু নির্দিষ্ট টপিক তোমাকে বেশ ভালোভাবে জেনে নিতে হবে, বাকিটা তুমি তোমার ফিল্ড অনুসারে পারবে। শিল্প প্রকৌশলের জন্য, তুমি নানা শিল্পের ডেটা নিয়ে কাজ করবে, মেডিকেল বা বায়োইনফরমেটিক্স হলে সে ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করবে, সোশ্যাল সাবজেক্টে পড়লে সে সম্পর্কিত ডেটা নিয়ে কাজ করবে। আর তুমি চাইলে অন্য ফিল্ডেও সহজেই যেতে পারবে। তবে সে বিষয়ে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পড়াশোনাটুকু নিজেকেই করে নিতে হবে। এখানে ডিগ্রি বা সাবজেক্ট বিষয় করে না, বরং তোমার দক্ষতাই মুখ্য।

ডেটা সায়েন্টিস্টদের বেতন

বর্তমানে ডেটা সায়েন্টিস্ট একটি বেশ সম্মানজনক পেশা। যুক্তরাষ্ট্রে একজন ডেটা সায়েন্টিস্টের বার্ষিক আয় গড়ে $90,560-$150,000। খোদ পাশের দেশ ভারতেই একজন এন্ট্রি লেভেল ডেটা সায়েন্টিস্ট বছরে ৫-১০ লাখ রুপি পান। ৫-৭ বছরের সিনিয়র লেভেলে গেলে দক্ষতা অনুযায়ী বছরে ৪০-৭৫ লাখ রুপি পর্যন্ত পেতে পারেন, যেখানে সমমর্যাদার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পান ১০-১২ লাখ রুপি এবং ইঞ্জিনিয়ার পান ৮-১০ লাখ রুপি। বলা হয়, ২০২৬ সালে ১১ মিলিয়ন ডেটা সায়েন্টিস্টের শর্টেজ থাকবে বিশ্বে। তাই, পেশা হিসেবে এর দাম এখন আকাশচুম্বী।

প্রোগ্রামিং-এর প্রবলেম সলভিং-এর মতোই এখানে একটা অ্যানালাইসিস করে ভালো আউটপুট আসলে প্রায় ইদের আনন্দ। অনেক রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট থেকে বাস্তবিক জীবনে অনেক কিছু শিখারও আছে। আছে একদম আবর্জনা থেকে নতুন কিছু খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। যেকোনো বিজনেসেই এখন ডেটা সায়েন্টিস্ট নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। কারণ, ডেটার প্রোপার ব্যবহার ছাড়া এই যুগে সফলতা পাওয়া অসম্ভব। আর ডেটার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারেন একজন দক্ষ ডেটা সায়েন্টিস্ট। আর ডেটা সায়েন্টিস্ট মানেই 'তথ্যের রাজা'!

টুইটার একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেখানে সর্বোচ্চ ২৮০ ক্যারেক্টারের একটি টুইট করা যায়। বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় না হলেও বহির্বিশ্বে এর বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। ডাটা সায়েন্টিস্টদের মধ্যে যারা ডাটা অ্যানালিস্ট ও বিল্ডার রয়েছেন তারা ইউজারদের সর্বোচ্চ পছন্দের বিষয়টি তাদের ফিডে যাতে প্রদর্শন করে সে ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন। টুইটারের অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করবে তাও একজন ডাটা সায়েন্টিস্টই বলে দেন। আমাদের টুইটারে ফলো করতে চলে যান পাশে দেওয়া লিংকে

https://twitter.com/TachyonTS

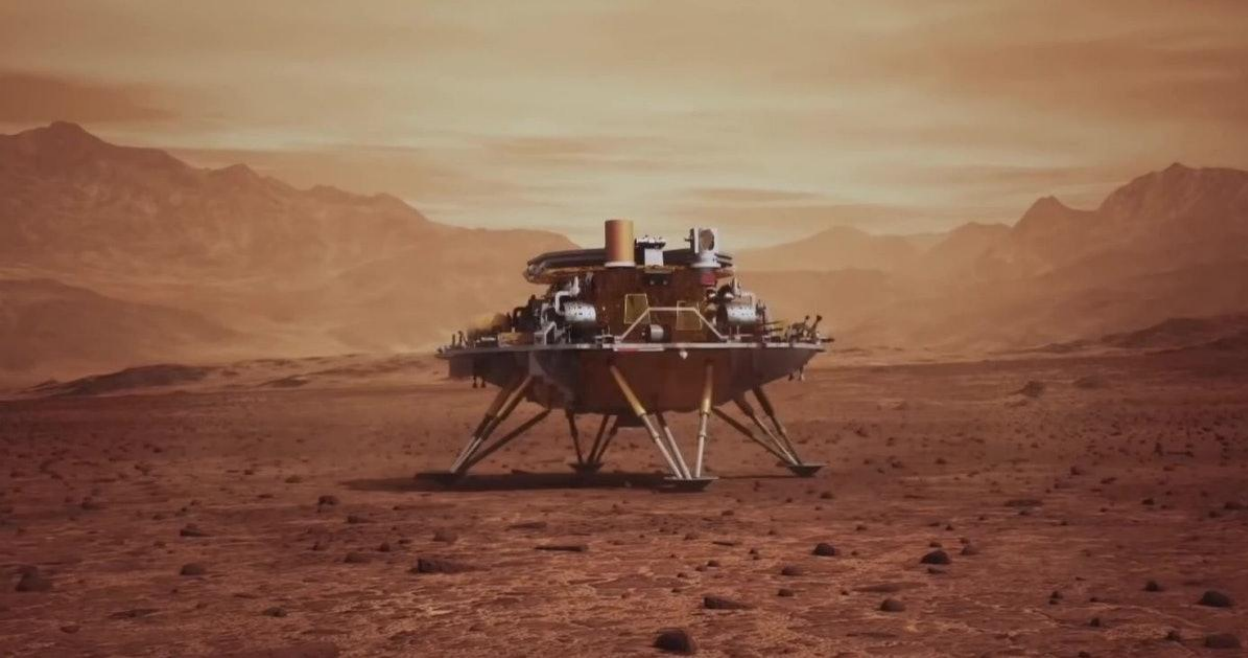

লাল গ্রহে অগ্নিদেবতা

আল যুবায়ের অংকন

কি, শিরোনাম শুনে কিছুটা রুপকথার গল্পের মতো মনে হলো? আসলে এটি কোনো রুপ কথার গল্প না। কিন্তু কয়েক শতক আগে এই সবকিছুই সম্ভব হতো শুধুই রূপকথার গল্পে, বাস্তবে নয়। কিন্তু এখন এসব কিছুই সত্যি।

এখন বলি 'লাল গ্রহে অগ্নিদেবতা' এই শিরোনামটির মানে কী! বলব। কিন্তু তার আগে একটি খুশির খবর জানান দরকার। গত ১৫ মে ভোর 5:18 মিনিটে পৃথিবীর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে মঙ্গলের মাটিতে চীনা রোভার Zhurong সফলভাবে অবতরণ করে। অনেকে হয়তো এখনই ধরে ফেলেছ আজকের শিরোনামের পিছনের গল্প। যারা ধরতে পারনি, সমস্যা নেই। এখুনি বুঝে যাবে। আমরা জানি, মঙ্গলকে লাল গ্রহ বলা হয়। কারণ এর পৃষ্ঠে প্রচুর আয়রন অক্সাইড (Fe_2O_3) আছে। এই যৌগের জন্যই রক্ত এবং মরিচা লাল দেখায়। অবশ্য মঙ্গলের পাথুরেপৃষ্ঠের ওই আবরণকে মরিচাও বলা চলে। তাও আজ আমরা একে মরিচা গ্রহ বলে ডাকব না। ডাকব লাল গ্রহ নামে। এইতো গেল লাল গ্রহের মানে কি। এখন আসি অগ্নিদেবতায়। এটা আবার কি? চীনা লোককথা অনুযায়ী Zhurong-এর অর্থ অগ্নিদেবতা এবং চীনা ভাষায় মঙ্গলকে বলা হয় Huoxing যার অর্থ হচ্ছে Fire Star

কিংবা অগ্নিতারকা। আমরা এই অগ্নিদেবতার অগ্নি তারার যাত্রা অর্থাৎ Zhurong রোভাটির মঙ্গল গ্রহের অভিযান নিয়ে জানার চেষ্টা করবো।

গতবছর 2020 সালের 23 জুন Wenchang Space Launch Center থেকে চীনের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা CNSA একটি রোভার ও একটি অরবিটার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিয়ানওয়েন-১ মহাকাশযানের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হয়। তিয়ানওয়েন-১ মহাকাশযানটি মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং এর সাথের অরবিটারটিসহ এটি মঙ্গলকে আরো প্রায় ৩ মাস প্রদক্ষিণ করে। অবশেষে, গত ১৫ মে 'আতঙ্কের নয় মিনিট' কাটিয়ে তা সফল ভাবে মঙ্গলে অবতরণ করে। বলে রাখা ভালো, একই সময়ে যাত্রা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা নাসার পঞ্চম রোভার যার নাম ছিল পারসেভারেন্স এবং এটিও

ঝুড়ং থেকে তোলা প্রথম ছবি। (ছবি স্বত্ব: সিএনএসএ)

তিয়ানওয়েন-১ কে লং মার্চ ৫-বি নামক রকেটের মাধ্যমে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘ ৮ মাসের যাত্রার পর ২০২১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি চীনের সফলভাবে মঙ্গলের মাটি স্পর্শ করে। একই সময়ে আরো একটি নভোযান মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে আর তা হচ্ছে সংযুক্ত আরব

আমিরাতের প্রথম অরবিটার 'Hope' এবং এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো কোনো আরব দেশ মহাকাশে যাত্রা শুরু করে। সবগুলোই কিন্তু কাছাকাছি সময়েই যাত্রা করেছিল এবং ফেব্রুয়ারির দিকে মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু পুরো পৃথিবীর আকর্ষনের কেন্দ্রে ছিল পারসেভারেন্স। কারণ এটির সাথে 'ইনজেনুইটি' নামের একটি হেলিকপ্টারও প্রেরণ করা হয় এবং এই প্রথম অন্য কোনো গ্রহে হেলিকপ্টার উড়াতে সক্ষম হয় মানব জাতি। সত্যি কি এটি অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয় যে মানুষ এখন প্রায় 327 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে থেকেও অন্য গ্রহে হেলিকপ্টার উড়াতে পারে! কিন্তু চীনের ঝুড়ং রোভার নিয়েও মানুষের আগ্রহের কমতি ছিল না। যেহেতু চীনের রোভার সম্প্রতি মঙ্গলে সফলভাবে অবতরণ করেছে তাই আজকে আমরা শুধু ঝুড়ং রোভার সম্পর্কেই বিস্তারিত জানবো।

চীনের এই মঙ্গল মিশনের সবচেয়ে কঠিন অংশ ছিল রোভারটিকে মঙ্গলের কক্ষপথ থেকে মাটিতে অবতরণ করানো। অর্থাৎ EDL পর্বটি।

মিশনের এই অংশটিকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়।

১. এন্ট্রি (Entry)

২. ডিসেন্ড (Descent) এবং

৩. ল্যান্ডিং (Landing)

এই অংশের প্রথম ধাপের জন্য তিয়ানওয়েন-১-কে অরবিটার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এরপর শুরু হয় এন্ট্রি স্টেজ। এই ধাপে কোণ আকৃতির তাপনিরোধক একটি সুরক্ষা ক্যাপসুলে করে তিয়ানওয়েন-১ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় এর হিট সিল্ড 1,300 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। এরপর এর গতি প্রতি ঘন্টায় 1000 মাইল থেকে কমিয়ে আনতে ডিসেন্ট স্টেজে এটির প্যারাসুটটি খুলে যায় এবং উপবৃত্তাকার পথে মঙ্গলের চারপাশের অনেকটা জায়গা ঘুরে এর লক্ষ্যের কাছাকাছি আসার পর চালু হয় এর 'রেট্রো ইঞ্জিন' যা এই ল্যান্ডারটিকে এর শেষ ধাপ অর্থাৎ ল্যান্ডিং স্টেজে থ্রাস্ট প্রদান করার মাধ্যমে ল্যান্ডারের গতি কমিয়ে এনে রোভারটিকে সঠিক স্থানে নামতে সাহায্য করে। এই তিনটি ধাপ সম্পন্ন হতে সাধারণত সময় নেয় 7 মিনিট। তাই নাসার বিজ্ঞানীরা এই সাত মিনিটের নাম দিয়েছেন - 'seven minutes of terror' কিংবা আতঙ্কের সাত মিনিট। কিন্তু Tianwen-1-এর ক্ষেত্রে সময় লেগেছে ৯ মিনিট। কাজেই, নামটা বদলে হয়ে গেল 'আতঙ্কের নয় মিনিট'। কিন্তু এই সময়টাকে আতঙ্কের নয় মিনিট বলা হয় কেন? এর কারণ হলো, এই সময়টায় বিজ্ঞানীরা অসহায় থাকে, কিছু একটা সমস্যা হয়ে গেলে কোনো কমান্ড দিয়েও লাভ নেই। পৃথিবী থেকে মঙ্গলে সংকেত যেতে সময় লাগে ১৮ মিনিটের মতো। এমতাবস্থায় কোনো যান্ত্রিক সমস্যা হলে বিজ্ঞানীরা কোনো কমান্ড দিলেও সেটি Tianwen-1-এর কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে লেগে যাবে ১৮ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে সব

শেষ! এই জন্যই এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা থাকে এবং বিজ্ঞানীরা শুধু প্রার্থনা করতে থাকে যেন কোনো যান্ত্রিক সমস্যার সৃষ্টি না হয়। না হলে এত দিনের সকল পরিশ্রম মুহূর্তেই শেষ। কিন্তু সুখবর হচ্ছে Tianwen-1-এর সাথে এমন কিছুই হয়নি। সফলভাবে মঙ্গলের মাটিতে নামার পর পৃথিবীর উদ্দেশ্যে সিগন্যাল পাঠায় Zhurong রোভার। এর প্রায় ১৮ মিনিট পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চীনা বিজ্ঞানীরা। এই ছিল কীভাবে চীনের প্রথম রোভার মঙ্গলে পৌঁছায়। এখন আমরা জানবো, এই রোভার কি কি করবে মঙ্গলের মাটিতে।

তিয়ানওয়েন-১ মিশনের অংশ হিসেবে ছিল- একটি অরবিটার। একটি ডেপ্লয়েবল ক্যামেরা, একটি ল্যান্ডার এবং Zhurong রোভার।

অরবিটারটি মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করবে এবং এর শক্তিশালী ডেপ্লয়েবল ক্যামেরার মাধ্যমে মঙ্গলের ছবি তুলবে। যেমনটি নাসার ২০০৫ সালে পাঠানো Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) করেছিল। এরপরের অংশটি হলো ল্যান্ডার, যা রোভারটিকে ল্যান্ডিং স্টেজের সময় রেট্রো ইঞ্জিনের থ্রাস্টের মাধ্যমে এর গতি কমাতে এবং মঙ্গলের মাটিতে রোভারটিকে নিরাপদে নামতে সাহায্য করবে। আর বাকি রইলো ঝুড়ং রোভার।

ঝুড়ং-কে নামানো হয়েছে মূলত মঙ্গলের উত্তরাঞ্চলে *'ইউটোপিয়া প্ল্যানিশিয়া'* নামের একটি পার্বত্য অঞ্চলে। আগামী ৯০ মঙ্গল-দিন ছয় চাকার এই রোভারটি ঘুরে বেড়াবে এই অঞ্চলে এবং গবেষনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে। যদি বইয়ের ভাষায় বলি তাহলে এই মিশনের পাঁচটি বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা -

১) মঙ্গলের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন নিয়ে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করা। বুঝতে চেষ্টা করা এর বিবর্তন এবং এভাবে বিবর্তিত হওয়ার কারণ।

২) মঙ্গলপৃষ্ঠ এবং ভূ-গর্ভস্থ স্তরগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। মাটিতে পানির উপস্থিতি, এর অতীত ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বুঝতে চেষ্টা করা।

৩) বিভিন্ন খনিজ ও পাথরের গঠন ও উপাদান সম্পর্কে জানা। বিভিন্ন প্রাচীন হ্রদ, নদী ইত্যাদিতে যেসব খনিজ পাওয়া যায়, সেসবের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ।

৪) মঙ্গলের জলবায়ু, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি সম্পর্কে জানা।

৫) মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ গঠন, চৌম্বক ক্ষেত্র, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ইত্যাদির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।

পরবর্তীতে, ২০৩০ সালের দিকে মঙ্গলের নমুনা সংগ্রহের জন্য আরেকটি মিশন পরিচালনা করতে চায় চীন। সেটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, এ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে ঝুড়ং

রোভারটি। পাশাপাশি তিয়ানওয়েন-১-এর অরবিটার বুঝতে চেষ্টা করবে এই নমুনা সংগ্রহ মিশনের সময় নমুনাগুলোকে কক্ষপথের ঠিক কোথায় আনলে তা সংগ্রহ করা সুবিধা হবে। এই পুরো মিশন নিয়ে আরো বিস্তারিত লিখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু চীনা সরকার তাদের এই মিশনের সকল তথ্য গোটা বিশ্বের সামনে এখনও তুলে ধরেনি। আশা করছি খুব শীঘ্রই তারা সবার জন্য তাদের এই ঝুড়ং রোভার থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত উন্মুক্ত করে দিবে।

(উইকিপিডিয়া, বিবিসি, সায়েন্টিফিক আমেরিকান, স্পেস ডট কম, ইউতৌসিফ ডট কম হতে তথ্যের ভিত্তিতে রচিত)

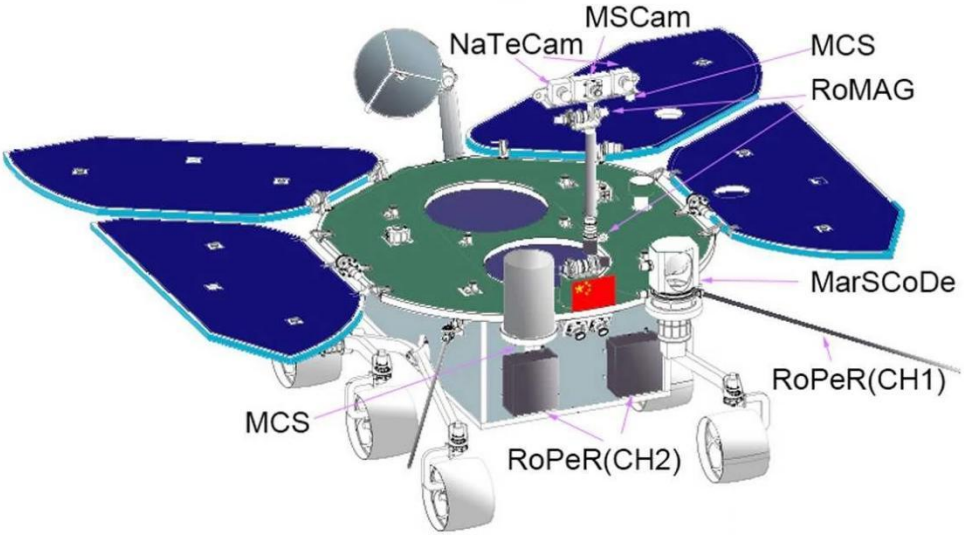

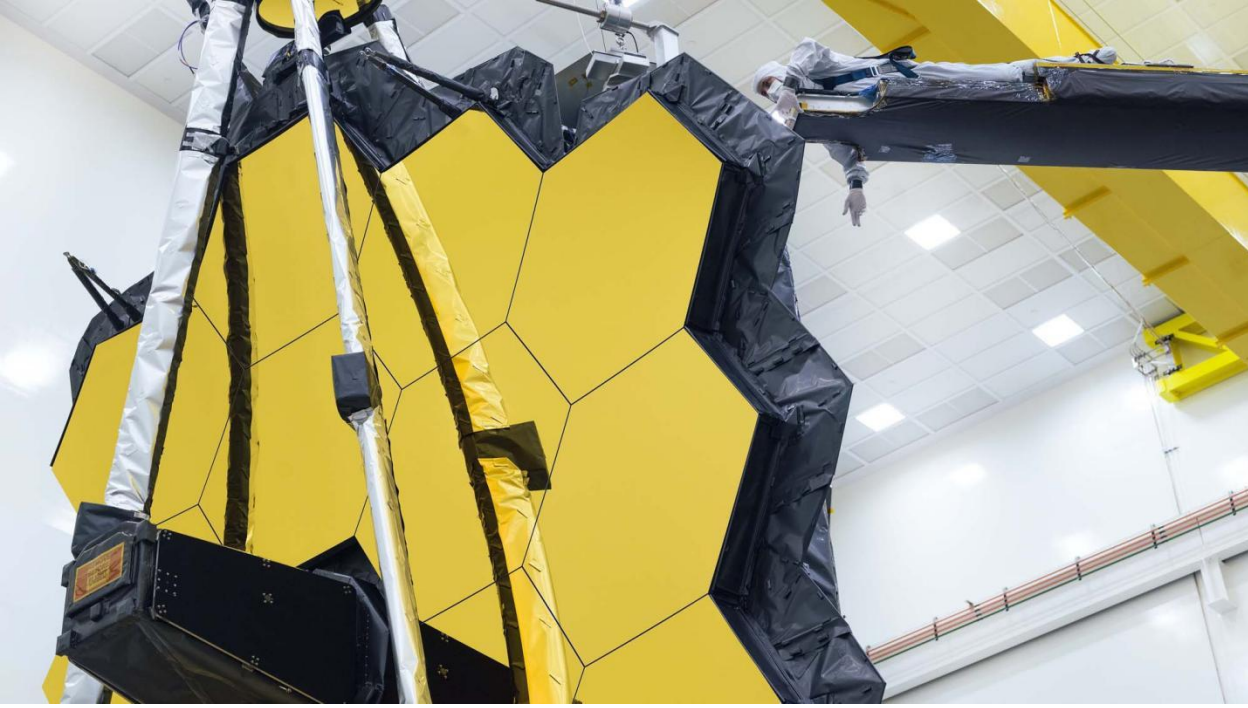

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের খুঁটিনাটি

সাইদুল হোসেন আল আমিন

১.

ইউরোপের সতেরোটা দেশ মিলে একটা সংস্থা গঠন করল। সংস্থাটার কাজ কী? সংস্থাটার কাজ একদম সিম্পল। শুধুমাত্র আকাশ, মহাকাশ পর্যবেক্ষণ আর গবেষণা করা। বর্তমানে এই সংস্থাটির মোট সদস্য রাষ্ট্র বাইশটি। সংস্থাটির নাম ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা সংক্ষেপে ESA। আর বাংলায় ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা!

কানাডায় উদ্ভাবন, বিজ্ঞান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক একজন মন্ত্রী আছেন। তার কাছে আবার একটা সংস্থা দায়বদ্ধ। মজার ব্যাপার হলো এই সংস্থাটির কাজও আকাশ, মহাকাশ নিয়ে। সংস্থাটার নাম কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি বা কানাডীয় মহাকাশ সংস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও একটা মহাকাশ সংস্থা আছে যার নাম সবার মুখে মুখে শোনা যায়। সংস্থাটার নাম কী? - NASA।

আচ্ছা, এবার থামো। আর কোনো সংস্থার নাম বলে বিরক্ত করব না। এই তিনটা মহাকাশ সংস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকলেই আপাতত চলবে।

এবার তোমরা জেনে অনেক অনেক অনেক খুশি হবে যে, এইমাত্র যে তিনটা মহাকাশ সংস্থার কথা বললাম এরা তিনজন মিলেমিশে, দিন-রাত এক

করে, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে সুন্দর একটা যন্ত্র বানাচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা আমাদের সুন্দর এই মহাবিশ্বের বিভিন্ন রহস্য উদঘাটন করতে পারব। তুমি কি জানো যন্ত্রটার নাম কি?

যন্ত্রটার নাম হলো জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। আজকে আমরা কথা বলব এই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে!

২.

আচ্ছা স্পেস টেলিস্কোপ কি? আমরা সাধারণত যেসব টেলিস্কোপগুলা নিয়ে নাড়াচাড়া করি সেগুলোই? আরে না সেগুলো স্পেস টেলিস্কোপ না। স্পেস টেলিস্কোপ নামটা শুনলেই একটু অনুধাবন করতে পারা উচিত যে এটা স্পেসে থাকে। মানে শূন্যে থাকে। যেমন হাবল টেলিস্কোপ কিন্তু একটা স্পেস টেলিস্কোপ। কারণ এটা শূন্যে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলছে।

তোমার মনে হতে পারে যে এত কষ্ট করে স্পেসে টেলিস্কোপ পাঠানোর দরকারটা কি? বিশ-ত্রিশটা বিশাল ফুটবল মাঠের সমান বড়ো একটা টেলিস্কোপ বানিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে সেট করে নিলেই হয়, তাই না?

আসলেই না। হয় না। কিছুতেই হয় না। তোমরা জানো যে, আমাদের পৃথিবীকে চারপাশ থেকে বায়ুমণ্ডল ঘিরে রেখেছে। যখন দূর-দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো থেকে বিভিন্ন টাইপের আলো আসে তখন সব রকমের আলো ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আসতে পারে না, কিছু আলো বায়ুমণ্ডল শোষণ করে নেয়, কিছুটা আবার প্রতিফলিত হয়ে চলে যায়। এসব কারণে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠে থাকা টেলিস্কোপগুলোর চোখে সেসব আলো ধরা দেয় না। ফলাফলস্বরূপ অনেক তথ্য আমাদের ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যায়।

এখন কথা হলো আমরাতো চাইলেই আর বায়ুমণ্ডলকে সরিয়ে ফেলতে পারি না। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের একদম বাহিরে বা একটু উপরে যেয়ে যদি টেলিস্কোপ সেট করে আসতে পারি তাহলে যেই তথ্যগুলো বায়ুমনণ্ডলের বাধায় পৃথিবী পৃষ্ঠে মিসিং হতো সেগুলো আমরা খুব সহজেই পেয়ে যেতাম। ঠিক এই কারণটার (আরো কারণ আছে) জন্যই স্পেস টেলিস্কোপ জিনিসটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা যারা স্পেস টেলিস্কোপের সাথে পরিচিত তারা নিশ্চয়ই হাবল স্পেস টেলিস্কোপের নাম শুনেছ। এই স্পেস টেলিস্কোপটি পৃথিবী থেকে ৫৫৯ কি.মি. দূরে বসে বসে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের কত তথ্য দিয়েছে, কত উপকার করেছে তা অন্য একদিন বলব। আপাতত আরও কিছু খুচরা কথা বলে তারপর সরাসরি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের আলোচনায় চলে যাব।

৩.

আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারবে **জেমস ওয়েব মানে কি?** আসলে এই জেমস ওয়েব হলো একজন মানুষের নাম। যিনি ছিলেন নাসার দ্বিতীয় মহা পরিচালক আর তার পুরো নাম হলো জেমস

এডউইন ওয়েভ। অ্যাপোলো প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত থাকায় এই লোকের আবার বেশ নাম ডাক আছে। এই জেমস এডউইন ওয়েবের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই স্পেস টেলিস্কোপটির নাম রাখা হয়েছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ!

তোমরা কি জানো জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটি পৃথিবী থেকে কতটুকু দূরে অবস্থান করবে?

একদম পনেরো লক্ষ কিলোমিটার দূরে! এতো বিশাল দূরত্ব বিজ্ঞানীদেরকে একটু চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। চিন্তার কারনটাও খুব স্বাভাবিক। হাবল স্পেস টেলিস্কোপটি সেট করার কিছুদিন বাদেই সেই টেলিস্কোপে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। তারপর নভোচারীরা শূন্যে যেয়ে সেটা মেরামত করে দিয়ে আসেন। (আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ

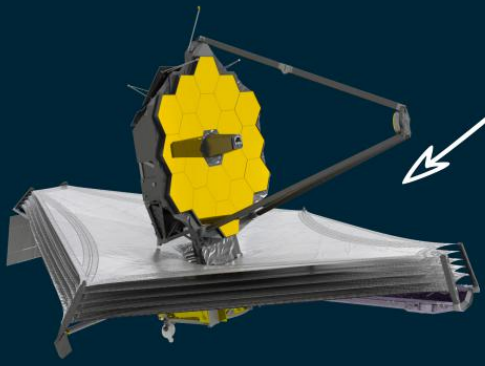

এখন পর্যন্ত মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী টেলিস্কোপ হবে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ

নাসা, ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি ও কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সির যৌথ তত্ত্বধানে কাজ করবে ওয়েব

সিগন্যাল গ্রহণ করতে ১৮ টি আয়না ব্যবহার করা হবে ওয়েব টেলিস্কোপে

আবলোহিত আলোর রেঞ্জে ওয়েব টেলিস্কোপ, মহাবিশ্বের শুরুর দিকে তৈরি হওয়া নক্ষত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করবে।

© ট্যকিয়ন

পৃথিবী পৃষ্ঠ থেক্ক ৫৫৯ কি.মি. দূরে বসে আছে)।

অন্যদিকে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপতো থাকবে পনেরো লক্ষ কিলোমিটার দূরে, আর সেটি পৃথিবী নয় বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। তো জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ উৎক্ষেপ পরবর্তী সময়ে যদি কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে সেটাকে এতো দূরত্ব পাড়ি দিয়ে মেরামত করতে যাওয়াটা হবে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই উৎক্ষেপ পরবর্তী সময়ে যেন এর মধ্যে কোনো রকমের যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা না দেয়, এজন্য এক্সপার্টরা অনেক ঘামও ঝরিয়ে যাচ্ছেন।

তাছাড়া জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের চোখ ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পাঁচস্তর বিশিষ্ট একটি টেনিস কোর্টের সমান সানশেড ব্যবহার করা হচ্ছে যার দৈর্ঘ্য প্রায় বাইশ মিটার আর প্রস্থ প্রায় বারো মিটার। ভাবতে পারছ, সবকিছু মিলিয়ে কত বিশাল হতে যাচ্ছে এই টেলিস্কোপটি?

এই টেলিস্কোপটির মূল যেই আয়নাটি সেটা হবে আঠারোটি বাহু বিশিষ্ট আর স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া। যা হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মূল আয়নার তুলনায় কয়েকগুন বড়।

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটিকে কিন্তু আদর করে জেডব্লিউএস্টি (JWST) নামেও ডাকা হয়। এই স্পেস টেলিস্কোপটি নির্মাণ ও উৎক্ষেপণে মোট ব্যয় হতে যাচ্ছে ৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা কি-না পৃথিবীর ইতিহাসে ষষ্ঠ ব্যায়বহুল স্পেস মিশনের বাজেট!

আরেকটা কথা জেনে রাখ, আমাদের সকলের প্রিয় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটি হতে যাচ্ছে মহাকাশে মানব প্রেরিত সবচেয়ে বড়ো স্পেস অবজারভেটরি! আর এটাকে পৃথিবী থেকে তার কক্ষপথ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাবে অ্যারিয়ান ফাইভ নামের একটি রকেট।

৪.

ছলেবলে-কলে-কৌশলে, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে অনেক তথ্য ইতোমধ্যে তোমাদের জানিয়ে ফেলেছি।

এখন একটু বলোতো, এই লম্বা বকবকানি শুনতে শুনতে তুমি কি ক্লান্ত হয়ে গেছ? আচ্ছা শুনো, ক্লান্ত হলে কিন্তু চলবে না, কারণ এখন আমরা জানব জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ প্রেরণের উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে!

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই টেলিস্কোপ ইনফ্রারেড আলো দেখতে পারে (আমরা কিন্তু সাধারণ চোখে ইনফ্রারেড আলো দেখতে পাই না)।

এই টেলিস্কোপ ব্যবহার করে আমরা বিগ ব্যাং-এর প্রায় আড়াইশ বছর পরের সময়কার শিশু মহাবিশ্বকে দেখতে পারব আর জানতে পারব সে সময়ে কেমন ছিল আমাদের এই মহাবিশ্বের অবস্থা।

তাছাড়া কীভাবে কীভাবে গ্যালাক্সিগুলো জন্মালো, বিকশিত হলো এরা বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে কদিন বাদে কীরূপ হবে এসব নিয়ে

বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।

এছাড়াও, আমাদের সৌরজগতের বাহিরে অন্যকোনো স্থানে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কি-না তা নিয়েও বিস্তার তথ্য সংগ্রহ করবে আমাদের জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।

আর আমাদের সৌরজগতের ইউরেনাস আর নেপচুনকে নিয়ে বিস্তারিত কাজ করবে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। তৈরি করবে এদের তাপমাত্রার মানচিত্র, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে কোন কোন উপাদান দিয়ে এরা গঠিত।

তাছাড়া ডার্ক ম্যাটার নিয়েও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।

এককথায় বলতে গেলে, একবার যদি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটি সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা যায় তবে তা হবে মানবজাতির বিশাল এক সাফল্য।

এতসব বলতে বলতে অধ্যাপক লুনাইয়ের বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমি মনে করি মহাবিশ্বকে জানা ও আবিষ্কারের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়ে আমরা অবস্থান করছি। আর জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ আমাদের এর পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাবে।"

অপর একজন মহাকাশবিজ্ঞানী অধ্যাপক জিলিয়ান রাইট বলেছেন, "এর আগে মহাকাশে এতবড়ো কোনো কিছুর সুবিধা আমরা পাইনি। একটি টেলিস্কোপের বেলায় বলা চলে যে, সেটি মহাবিশ্বের এক একটি জানালা খুলে দেয়— আর জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের বেলায় এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"

অতএব বুঝতেই পারছ, জেডব্লিউএসটি (JWST) মহাকাশ ও সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষণায় কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে!

৫.

যাইহোক, খুবসম্ভবত আমাদের আজকের এই আলোচনা এখানেই শেষ হচ্ছে। শেষ করার আগে বলে যাই, যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আগামী ১৮ ডিসেম্বর জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটি তার গন্তব্যের উদ্দেশ্য পৃথিবী ছেড়ে যাবে (যদিও এর আগে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের লঞ্চিং ডেট ১৭ বারের মতো বদল করা হয়েছে)। তো, সেই ১৮ ডিসেম্বরের আশায় অনেক অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বসে রইলাম।

https://tachyonts.com

ধূমকেতুর আদ্যোপান্ত

মোঃ সাজিদ রায়হান

আজকের এই তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে এমন কাউকে পাওয়া কঠিন যে ধূমকেতুর নাম শোনেনি। আমাদের সৌরজগতের একটি সদস্য ধূমকেতু। বহু আগে থেকেই মানুষ ধূমকেতু সম্পর্কে অবগত। প্রাচীনকালে আকাশের তারামণ্ডলী ছিল তাদের কাছে এক ধরনের ক্যালেন্ডারস্বরূপ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানুষ তারাদের দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন ছবির একই প্যাটার্ন বছরের বিভিন্ন সময়ে লক্ষ করতেন। তারা জেনে যেতেন কখন শীত বা গরম আসবে, কখনই বা শিকারে যেতে হবে। কিন্তু যখনই সেই ক্যালেন্ডার এ হঠাৎ করে ধূমকেতুর মতো একটি আশ্চর্যজনক বস্তুর আবির্ভাব ঘটে তখন তারা বিষয়টা ভালোভাবে নেয়নি। বিশ্বের সকল সভ্যতায় ধূমকেতুকে দেখা হয়েছে অশুভচিহ্ন হিসেবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, নেতার মৃত্যু সবই ছিল এর মধ্যে। এমনকি ইংরেজি শব্দ Disaster (DIS-ASTER) শব্দটিও এসেছে একটি গ্রিক শব্দ থেকে যার অর্থ Bad Star যেটি এসেছে ধূমকেতু থেকে।

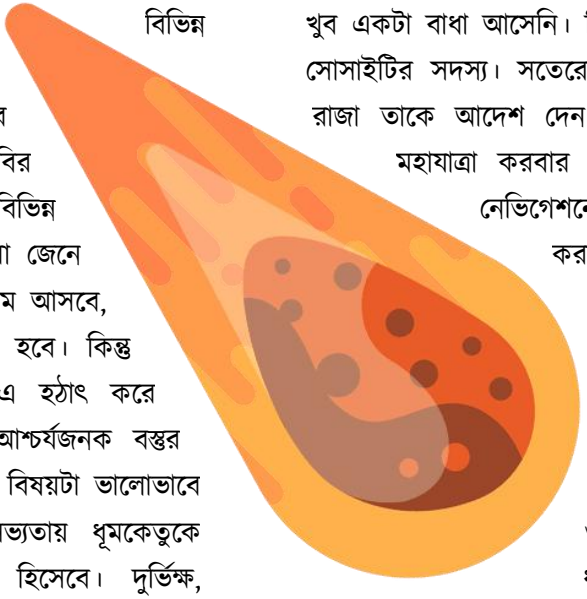

রেনেসাঁর আগে পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিল ধূমকেতু। টাইকো ব্রাহে প্রথম ধূমকেতু বা কমেটকে সৌরজগতের একটি বস্তু হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে প্রথম এ নিয়ে বিস্তরগবেষণা চালান এডমন্ড হেলি। এডমন্ড হেলি ইংল্যান্ডের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তার গবেষনায় খুব একটা বাধা আসেনি। তিনি ছিলেন রয়েল সোসাইটির সদস্য। সতেরো শতকে ব্রিটেনের রাজা তাকে আদেশ দেন সমুদ্রপথে তিনটি মহাযাত্রা করবার ব্রিটিশ নৌবাহিনীর নেভিগেশনের সমস্যা দূর করার জন্য। তিনি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথম তারাদের একটি ম্যাপ তৈরি করেন। তিনি এ-ও লক্ষ করেন যে ধূমকেতুসমূহ একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময় পরপর আসে। তিনিই প্রথম নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্যায় ব্যবহার করেন। অনেক বইপত্র ও গবেষণাপত্র দেখে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে ১৪৫৬, ১৫৩১, ১৬০৭, ১৬৮২-এর

ধূমকেতুগুলো আসলে একই ধূমকেতু। এটাই সেই ধূমকেতু যেটি তিনি নিজে আবিষ্কার করেন যা হেলির ধূমকেতু নামে পরিচিত। তো এখন আর ধূমকেতু কোনো অশুভ চিহ্ন নয় বরং সৌরজগতের একটি সদস্য।

তবে একটি প্রশ্ন রয়েই যায়, "এই ধূমকেতু আসে কোথা থেকে; একবার আসার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর আসে কীভাবে?"

এই প্রশ্ন প্রশ্নই রয়ে যায় অনেকদিন। বিশ শতকে এসে জন ওর্ট প্রথম এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি চিন্তা করেন যেহেতু এগুলো বারবার আসতেই থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এদের অনেক বড়ো একটি গুচ্ছ রয়েছে সৌরজগতের একদম বাইরের দিকে। তিনি এর গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন এবং এর নাম দেন ওর্ট ক্লাউড বা ওর্ট মেঘ। এখানে ধূমকেতুগুলোকে উল্কার মতোই দেখায় তবে তা উল্কা নয়। এটি সৌরজগতের থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে এবং এখানে ট্রিলিয়নেরও বেশি ধূমকেতু রয়েছে। তবে সেখানে সূর্যালোক পৌঁছায় না। তাই সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ধূমকেতুগুলো সৌরজগতের একদমই প্রান্তে যে অন্যকোনো নক্ষত্রের সামান্যতম আকর্ষণও এগুলিকে মুক্ত করে দিতে পারে। যদিও বলা হচ্ছে সেগুলো গুচ্ছাকারে থাকে তবুও প্রতিটি থেকে আরেকটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে শনির দূরত্বের সমান। উজ্জল আলো পৌঁছাতে পারে না বলে ওর্ট ক্লাউড এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে বিজ্ঞানীরা এখনও জন ওর্ট-এর যুক্তি মেনে নেন। তবে ভয়েজার-2 মিশনে দেখা যায় কুইপার বেল্টে ধূমকেতু ও উল্কা দুটোই রয়েছে। যেটি সৌরজগতের শেষ গ্রহ নেপচুনেরও পরে; সূর্য থেকে 30-50 AU দূরে (এক AU হলো সূর্য আর

হ্যালির ধুমকেতু

পৃথিবীর দূরত্ব)। তবে এগুলো তুলনামূলকভাবে ছোটো।

এবার ধূমকেতুর গঠন নিয়ে আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি ধূমকেতু আর উল্কা এক নয়। উল্কাগুলো বেশিরভাগ পাথুরে পদার্থ দিয়ে তৈরি। এগুলোর সাধারণত চলন হয় না। আবার ধূমকেতু বেশিরভাগ ঠান্ডা বরফ জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। শুধু H_2O নয় অ্যামোনিয়া (NH_3), CO_2 (dry ice) ইত্যাদি পদার্থ কঠিন অবস্থায় থাকে। তবে কিছুটা পাথুরে কঠিন পদার্থও থাকে। অ্যাস্ট্রোনমার ফ্রেড হিপল ধূমকেতু কে "Dirty Snowballs" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আকাশে একটি কমেট দেখা গেলে মূলত একটি বিন্দু থেকে একটি আলো ছড়িয়েছে বলে মনে হয়। কমেটের শক্ত পাথুরে অংশকে বলা হয় নিউক্লিয়াস, বরফের মত অংশকে বলে কোমা। আর বাকি ছড়িয়ে থাকা অংশকে বলে টেল। আয়ন টেল এবং ডাস্ট টেল এই দুধরনের টেল থাকে একটি কমেটে।

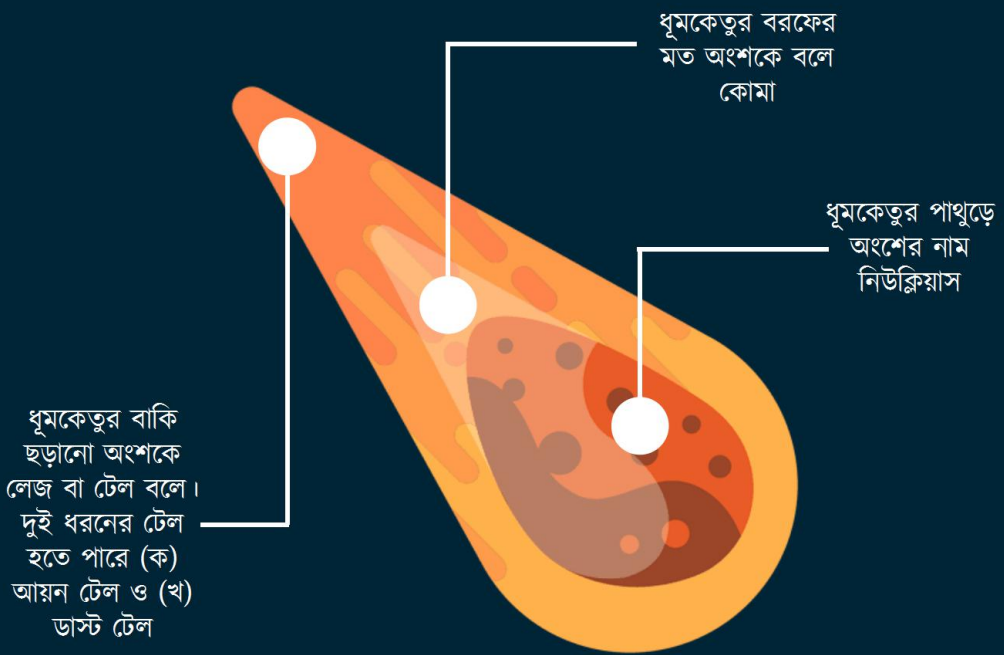

© ট্যবিয়ন

চলুন একটি যাত্রা করা যাক। ধরুণ ওর্ট ক্লাউড থেকে একটি ধূমকেতু সৌরজগতের দিকে আসতে শুরু করল। প্রথমেই আসার পথে সৌরজগতের শেষগ্রহ নেপচুনের কাছে এসে নেপচুনের অভিকর্ষের কারণে গতিপ্রাপ্ত হবে ধূমকেতুটি। আবার শনি পেরিয়ে বৃহৎ বৃহস্পতির কাছে আসতেই আরো বেশি অভিকর্ষজ গতি লাভ করবে ধূমকেতুটি। এরপর সূর্যের কাছাকাছি আসতেই একটি দৃষ্টিনন্দন রূপান্তর শুরু হবে। সূর্যের তাপে ধূমকেতুর বরফ অংশটি ঊর্ধ্বপাতিত হতে শুরু করবে। অর্থাৎ কঠিন থেকে একেবারে বাষ্পে পরিণত হবে। এই ক্ষুদ্রকণা বা ডাস্টগুলোর মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ার কথা চারিদিকে। কিন্তু কিছুটা গতি জড়তা এবং সূর্যের আলোক কণার একেবারে হালকা চাপেও ডাস্টগুলো বিপরীত দিকে সরে যেতে থাকে এবং সৃষ্টি হয় ডাস্ট টেলের। তবে অল্পচাপ থাকে, বিধায় খুব অল্পগতিতে ছড়িয়ে পড়ে এটি। আবার একই সময়ে গ্যাসীয় অণুগুলো সৌরবায়ুর চাপে ইলেকট্রন হারিয়ে আয়নে পরিণত হয় এবং নিউক্লিয়াসের বিপরীতে সরে যায়। তবে এক্ষেত্রে ডাস্ট টেল এর চেয়ে গতি বেশি থাকে এবং এজন্য ডাস্ট টেলের চেয়ে আলাদা করে দেখা যায় আয়ন টেল-কে। ধূমকেতুর কক্ষপথ খুবই সরু রকমের উপবৃত্তাকার হয়। আকারের উপর নির্ভর করে কয়েকবার সূর্যের চারদিকে ঘোরার পর ধূমকেতুটি বিলীন হয়ে যাবে তবে এখনও অজানা এক কারণে নির্দিষ্ট সময় পর আবার ফিরে আসবে ধূমকেতুটি।

এবার জেনে নেওয়া যাক কয়েকটি সুপরিচিত ধূমকেতু সম্পর্কে। কক্ষপথের পর্যায়কালের উপর নির্ভর করে ধূমকেতু পর্যায়ক্রমিক ও অপর্যায়ক্রমিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেগুলোর পর্যায়কাল 200 বছর বা তারও বেশি সেগুলো অপর্যায়ক্রমিক। এগুলো সাধারণত সূর্যকে একবারই প্রদক্ষিণ করে। যেগুলোর 200 বছরের কম সেগুলো পর্যায়ক্রমিক। কমেট হেলি, কমেট হেল-বপ, কমেট ওয়েস্ট এরকম কিছু সুপরিচিত কমেট।

কমেট হেলি : অ্যাডমন্ড হেলি এটি আবিষ্কার করেন। এটি 76 বছর পরপর দেখা যায় পৃথিবীতে। শেষবার 1986 সালে দেখা গিয়েছিল এবং আবার দেখা যেতে পারে 2061 সালে।

কমেট Swift-Tuttle : 133 বছরের পর্যায়কালের কমেট। এর নিয়ারআর্থ অরবিটের জন্য একে 'the single most dangerous object known to humanity' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯২ সালে দেখা যাওয়া কমেটটি আবার ২১২৬ সালে দেখা যাবে (তাও খালি চোখে)

কমেট Shoemaker-Levy-9 : এই কমেটটি ১৯৯৩ সালে আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯৪ সালে এটি বৃহস্পতির কাছে এসে অভিকর্ষের টানে বৃহস্পতির রেডস্পটে ক্র্যাশ করে ভেঙে যায়।

কমেট ওয়েস্ট : ১৯৭৫ সালে আবিষ্কৃত কমেটটি একটি অপর্যায়ক্রমিক কমেট। আবার দেখা যাওয়ার কথা ৫৫৮০০০ বছর পর।

কমেট হেল-বপ : ১৯৯৭ সালে দেখা যাওয়া এই কমেটটি আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড়ো আর উজ্জ্বল কমেট হিসেবে স্বীকৃত। এটিতে প্রথমবারের মতো কোনো কমেট-এ আর্গন ও সোডিয়াম পাওয়া যায়। আবার ফিরে আসবে ৪৩৮০ সালে।

অনেকের মাথায় এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে ধূমকেতু-গবেষণা কেন গুরুত্বপূর্ণ। নাসার Rossetta মিশনে কমেট 67-P-এর কক্ষপথে প্রবেশ করে কমেটটিতে 16টি (N_2, O_2-সহ) জৈবযৌগের উপস্থিতি পাওয়া যায়। নাসার Stardust মিশনে কমেট Wild-2-তে অনেক জৈবযৌগের সাথে অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডই জীবের ডিএনএতে থাকে অর্থাৎ ধূমকেতু বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যেতে পারে প্রাচীনকালে পৃথিবীতে কখন এবং কীভাবে এই মৌলগুলো এসেছে।

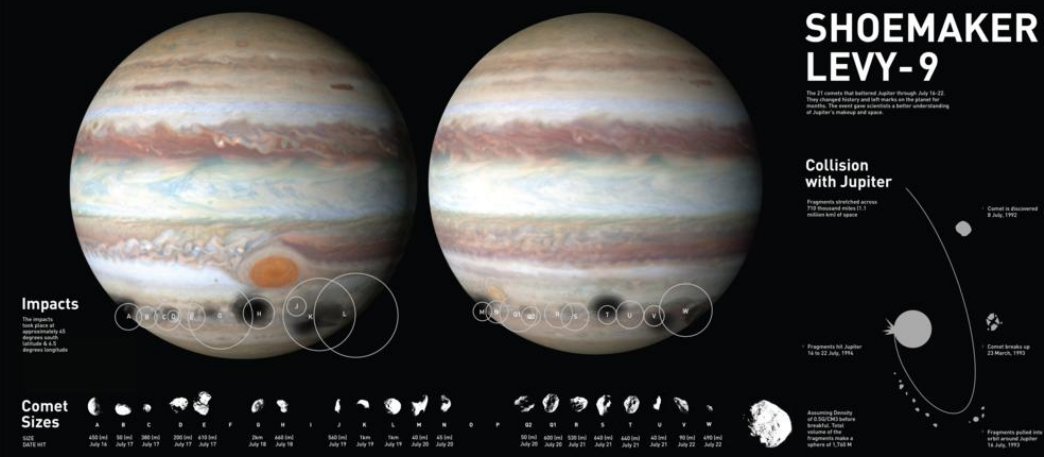

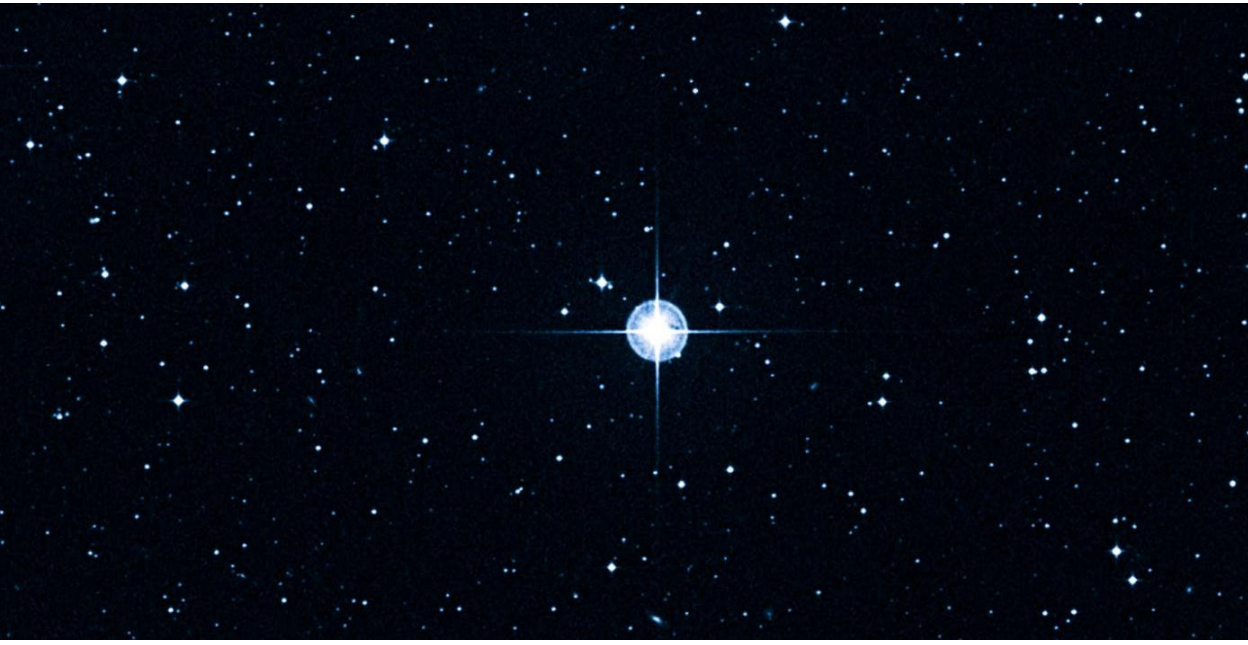

মহাবিশ্ব সৃষ্টির সামান্য পরেই তৈরি হয়েছিল যে নক্ষত্র

কে. এম. শরীয়ত উল্লাহ

১৯১২ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের পৃথিবী থেকে প্রায় ২০০ আলোকবর্ষ দূরে তুলা নক্ষত্রমণ্ডলে একটি নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। এর নাম দেওয়া হয় মেথুসেলাহ। ক্যাটালগে এর নাম HD 140283 । তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই নক্ষত্রটির বয়স পরিমাপ করে পাওয়া গেছে ১৪.৪৬ বিলিয়ন বছর যা আমাদের মহাবিশ্বের বয়সের (১৩.৭৮৭ বিলিয়ন বছর) চেয়ে বেশি! এটি কীভাবে সম্ভব যে আমাদের মহাবিশ্বের অভ্যন্তরের একটি নক্ষত্র স্বয়ং মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে?

আসল কথা হচ্ছে এটি সম্ভব না এবং এই নক্ষত্রটির বয়স আসলে ১৪.৪৬ বিলিয়ন বছরও নয়। তাহলে কাহিনি কী?

অনেকে মেথুসেলাহকে মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো নক্ষত্র হিসেবে বিবেচনা করে। তবে আসলে এটি সবচেয়ে পুরোনো নক্ষত্র নয়। বরং এর থেকেও আদিকালে নক্ষত্র গঠন হওয়া সম্ভব। একটি নক্ষত্র কত বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল তা বের করতে আমাদের তিনটি বিষয় জানতে হয়। (ক) নক্ষত্রের দীপন তীব্রতা (আরো সহজে বললে নক্ষত্রের উজ্জলতা) (খ) পৃথিবী থেকে ঐ নক্ষত্রের

দূরত্ব (গ) ওই নক্ষত্রের মধ্যে থাকা ধাতুগুলোর পরিমাণ।

নক্ষত্রের উজ্জলতা আমরা খুব সহজেই পরিমাপ করতে পারি। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে 'প্যারালাক্স' একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এরপর বাকি রইল নক্ষত্রে ধাতুর পরিমাণের ব্যাপারটা। একটি নক্ষত্রে কী কী ধাতু আছে তা 'স্পেকট্রস্কোপি' নামক পদ্ধতির সাহায্যে খুব সহজেই বের করে ফেলা যায়। তারপর ওই নক্ষত্রে হাইড্রোজেন থেকে ভারী কী কী মৌল আছে তা চিহ্নিত করা হয়। সেইসকল মৌলগুলোর পরিমাণকে হাইড্রোজেনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় মেটালিসিটি বা ধাতবতা। এটিই আমাদের তিন নং পয়েন্ট ছিল।

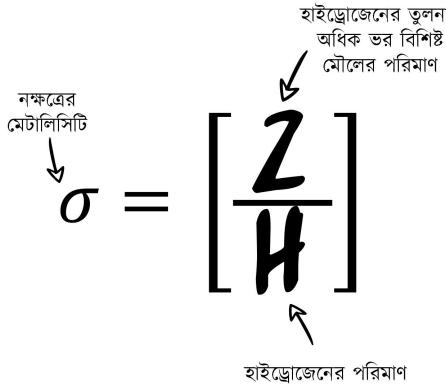

আমাদের মহাবিশ্বে প্রথমদিকে যে নক্ষত্রগুলো গঠিত হয়েছিল তা অধিকাংশই হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। এর কারণ আমাদের মহাবিশ্বে শুরুর দিকে কেবলই হাইড্রোজেন ছিল। তখনও ফিউশন হয়ে হিলিয়াম তৈরি হয়নি। যেই ধরনের নক্ষত্রগুলো প্রায় সমস্ত অংশই হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি তাদের বলা হয় 'পপুলেশন III' নক্ষত্র। এদের মেটালিসিটি প্রায় ১। এখন পর্যন্ত 'পপুলেশন III' নক্ষত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের নক্ষত্র এখনো তাত্ত্বিকই রয়ে গেছে।

ধারণা করা হয়, এই 'পপুলেশন III' নক্ষত্রের সুপারনোভা বিস্ফোরণের অবশেষ থেকেই হাইড্রোজেনের তুলনায় ভারী মৌলবিশিষ্ট নক্ষত্র তৈরি হয়েছে। তাদেরকে বলা হয় 'পপুলেশন II' নক্ষত্র। মেথুসেলাহ একটি 'পপুলেশন II' নক্ষত্র। অর্থাৎ মহাবিশ্বের সৃষ্টিলগ্নেই মেথুসেলাহ সৃষ্টি হয়েছে এমন বলা ভুল হবে।

২০১৩ সালে বিজ্ঞানীদের একটি দল এই মেথুসেলাহ নক্ষত্রটি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং এর বয়স বের করেন 14.46 ± 0.80 বিলিয়ন বছর। (Bond et al. 2013) এখানে লক্ষ রাখার মতো বিষয় হচ্ছে এর বয়স কিন্তু সরাসরি ১৪.৪৬ বিলিয়ন বছর নয়। বরং এর বয়সের পরিমাপে একটি ত্রুটি আছে। এই ত্রুটির মান ০.৮০ বিলিয়ন বছর। এই ত্রুটি এসেছে আমাদের পরিমাপে ত্রুটি ও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে। এই ত্রুটি গণনায় ধরলে মেথুসেলাহের বয়স হবে ১৩.৬৬ বিলিয়ন

মহাবিশ্বের বয়সের সমান হলেও সর্বোচ্চ বয়সটি আমাদের মহাবিশ্বের বয়সের থেকে বেশি দেখাচ্ছে। তো এখানে আসলে আমরা যা দেখছি, মহাবিশ্বের আগে নক্ষত্রটি সৃষ্টি হওয়ার যে ধারণা তা কেবলই আমাদের ত্রুটির ফল। এর সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।

তথ্যসূত্র

Bond, H. E., Nelan, E. P., VandenBerg, D. A., Schaefer, G. H., & Harmer, D. (2013). HD 140283: A star in the solar neighborhood that formed shortly after the Big Bang. *The Astrophysical Journal Letters*, *765*(1), L12.

বিজ্ঞান লেখালেখি করতে যারা ভালোবাসেন, তারা তাদের কাজগুলোকে আরেকধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে যুক্ত হন আমাদের সাথে। আপনাদের চমৎকার সকল লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের ওয়েবে ও ফেইসবুক গ্রুপে। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে লেখার হাত আরো কীভাবে প্রফেশনাল করা যায়, তার জন্য রয়েছে আমাদের মেন্টর।

JOIN US

tachyonts.com/join-us/

শুক্রগ্রহে নাসার দুই মিশন

নুসরাত জাহান

মোটামুটি ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো নাসা শুক্রগ্রহ নিয়ে নানা পরিকল্পনা শুরু করেছে। নাসার 'State of Nasa' ব্রিফিংয়ে সংস্থাটি ঘোষণা করেছে তাদের পরবর্তী ডিসকভারি প্রোগ্রামের দুইটি মিশন হবে উত্তপ্ত এবং বিষাক্ত গ্রহ শুক্রকে ঘিরে। নাসা তার ডিসকভারি প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে দুটি নতুন মহাকাশযান পাঠাবে শুক্রগ্রহে। এদের মধ্যে একটি হলো DAVINCI+ এবং অপরটি VERITAS.

এই মিশন দুটির মূল উদ্দেশ্য হলো এটা বুঝা যে কীভাবে পৃথিবীর সাথে অনেকাংশ মিল থাকা সত্ত্বেও গ্রহটি একটি নরকে পরিণত হয়েছে। শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠের অবস্থা কেন এত খারাপ যে তার পৃষ্ঠে সীসা গলানোও সম্ভব! নাসার তত্ত্বাবধায়ক বিল নেলসন বলেছেন,

> এই মিশন দুটি সমগ্র বিজ্ঞানসমাজকে এমন একটি গ্রহ অনুসন্ধান করার সুযোগ করে দেবে যা নিয়ে গত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে মাথা ঘামানো হয়নি।

DAVINCI+ এই গ্রহটির বায়ুমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করবে। গ্রহটি কীভাবে গঠিত এবং কীভাবে বিবর্তিত হলো তা নির্ধারণের পাশাপাশি গ্রহটিতে কখনো কোনো সমুদ্র ছিল কি না তা নির্ধারণ করবে। অন্যদিকে VERITAS গ্রহটির ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস নির্ধারণের জন্য এর পৃষ্ঠের মানচিত্র তৈরি করবে যার সাহায্যে বুঝা যাবে যে কেন গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে এতটা ভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে। গ্রহটিকে আবর্তনকালীন একটি সিন্থেটিক অ্যাপারেচার রাডারের মাধ্যমে এর প্রায় সমগ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার একটি নকশা তৈরি করবে যার সাহায্যে একটি নিখুঁত 3D মানচিত্র তৈরি করা যাবে। সেই সাথে প্লেট টেকটনিক্স এবং আগ্নেয়গিরির মতো প্রক্রিয়া গ্রহটিতে এখনো সক্রিয় আছে কি না তা নির্ধারণ করবে। প্লেট টেকটনিক্স আধুনিক বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার। পৃথিবীতে সংঘটিত ভূমিকম্পের জন্য দায়ী এই প্লেট টেকটনিক্স। বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটিকে ব্যবহার করে ভূমিকম্প ছাড়াও আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ, পর্বত সৃষ্টি এবং মহাসাগর ও মহাদেশ সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

গ্রহের সৌন্দর্য : মেরুজ্যোতি

ফাহমিদা হক হৃদি

আমাদের দেশের মানুষ রাতের বেলা সাধারণত কালো আকাশ দেখে অভ্যস্ত। কেননা রাতের বেলা সূর্যের আলো পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে যেখানে রাতের বেলাতেও সবুজ, বেগুনি, লাল এসব রঙের আকাশ দেখা যায় (তবে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে, সবসময় না)। এই দেশগুলোর অবস্থান উঁচু অক্ষাংশের দিকে। রাতের বেলা এমন আকাশের রঙিন হওয়ার ঘটনাকে অরোরা বা মেরুজ্যোতি বলে। এই অরোরা নিয়ে পুরাণে অনেক কুসংস্কারের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু সব কুসংস্কার এড়িয়ে মানুষ তার মাঝের বিজ্ঞানকে খুঁজে পেয়েছে।

অরোরা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

অরোরা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ হলো পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র, সূর্য এবং বায়ুমণ্ডল। আমরা জানি, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি

কিলোমিটার। কিন্তু এত দূরত্বে থেকেও সূর্যের প্রভাব আমাদের পৃথিবীর উপর পড়ে এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত চার্জ মুক্ত হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং যখন এই মুক্তচার্জগুলো পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ও বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসছে তখন প্রতিমুহূর্তে প্রতিক্রিয়া করছে। আমাদের পৃথিবীর উপরে বেশকিছু স্তর রয়েছে যেখানে বাতাস-সহ অনেক উপাদান রয়েছে। তাই কোনোকিছুকে পৃথিবীর বাইরে থেকে ভূমিতে প্রবেশ করতে হলে এসব স্তরকে অতিক্রম করেই আসতে হবে। যখন সূর্য থেকে মুক্ত হওয়া চার্জিতকণাগুলো (প্লাজমা) পৃথিবীতে আসতে চায় তখন পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র এসব কণাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। আমরা জানি, পৃথিবী একটি বিদ্যুৎ-পরিবাহক। তাই এটি মুক্ত হওয়া চার্জিতকণাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। (ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট কোনো বস্তুকে ভূ-সংযুক্ত করা হলে পৃথিবী থেকে ঋণাত্মক চার্জ এসে একে নিস্তড়িৎ করে আবার ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কোনো বস্তুকে ভূ-সংযুক্ত করা হলে বস্তুটি থেকে চার্জ এসে নিস্তড়িৎ হয়।) সূর্য থেকে মুক্ত চার্জিতকণাগুলো পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের কারণে পৃথিবীর মাটিতে চলে আসতে চায়। এই চলে আসতে চাওয়ার সময় চার্জগুলোকে ওজোনস্তর-সহ বায়ুমণ্ডলকে অতিক্রম করতে হয় এবং সূর্য থেকে আগত এই মুক্তচার্জবিশিষ্ট কণাগুলো বায়ুমণ্ডলের অণু-পরমাণুগুলোকে আঘাত করে এতে বায়ুমণ্ডলের অণু-পরমাণুগুলো আন্দোলিত হয়। যেহেতু পরমাণু নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত তাই যখন সূর্য থেকে আগত কণাগুলো বায়ুমণ্ডলের পরমাণুকে আঘাত করে তখন চার্জগুলো ঘুরতে ঘুরতে উচ্চশক্তিস্তর থেকে নিম্নশক্তিস্তরে গমন করে। আবার যখন চার্জ উচ্চশক্তিস্তর থেকে নিম্নশক্তিস্তরে গমন করে তখন সেটা ফোটন বা আলোকশক্তিতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় আকাশে যখন আলো সৃষ্টি হয় তখন তাকে মেরুজ্যোতি বা অরোরা বলা হয়।

অরোরাকে কেমন দেখা যায়?

অরোরাকে মাঝেমাঝে আলোর পর্দার মতো দেখায়। তবে এরা গোলাকার, সর্পিলাকার বা বাঁকানোও হতে পারে। অরোরা সাধারণত সবুজ রঙের দেখা যায়। তবে লাল ও বেগুনি রঙের অরোরাও মাঝেমাঝে দেখা যায়। সবুজ অরোরার জন্য দায়ী হলো অক্সিজেন এবং লাল ও বেগুনি রঙের আরোরার জন্য দায়ী হলো নাইট্রোজেন।

বাংলাদেশে কি আরোরা দেখা যায়?

না। কারণ বাংলাদেশ ২০°৩৪’ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮’ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ এটি প্রায় মাঝ অক্ষাংশের দেশ। তাই এখান থেকে অরোরা দেখা সম্ভব না। এছাড়াও এ

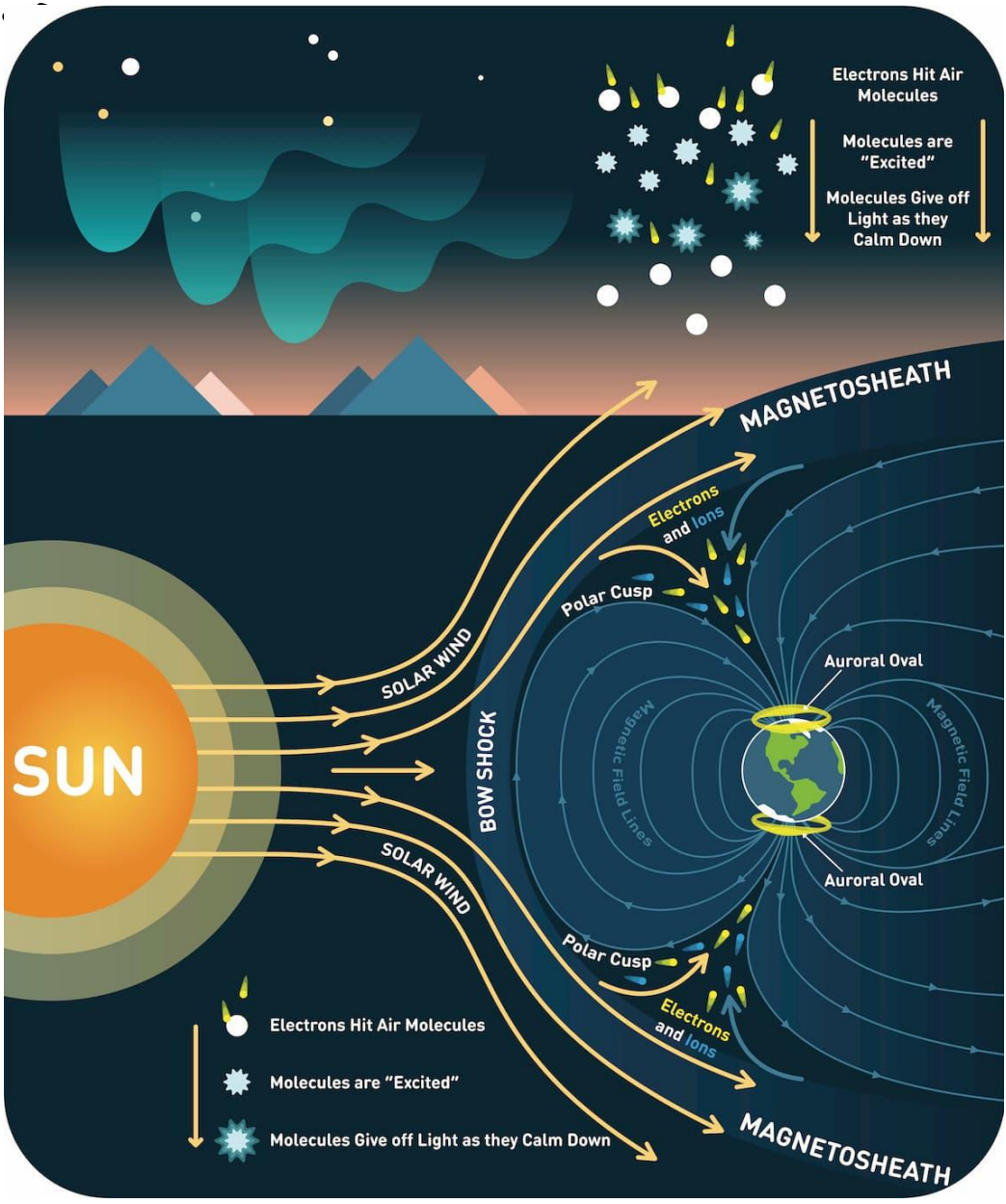

অঞ্চলে ভূ-চুম্বকের প্রভাব মেরুঅঞ্চলের মতো না।

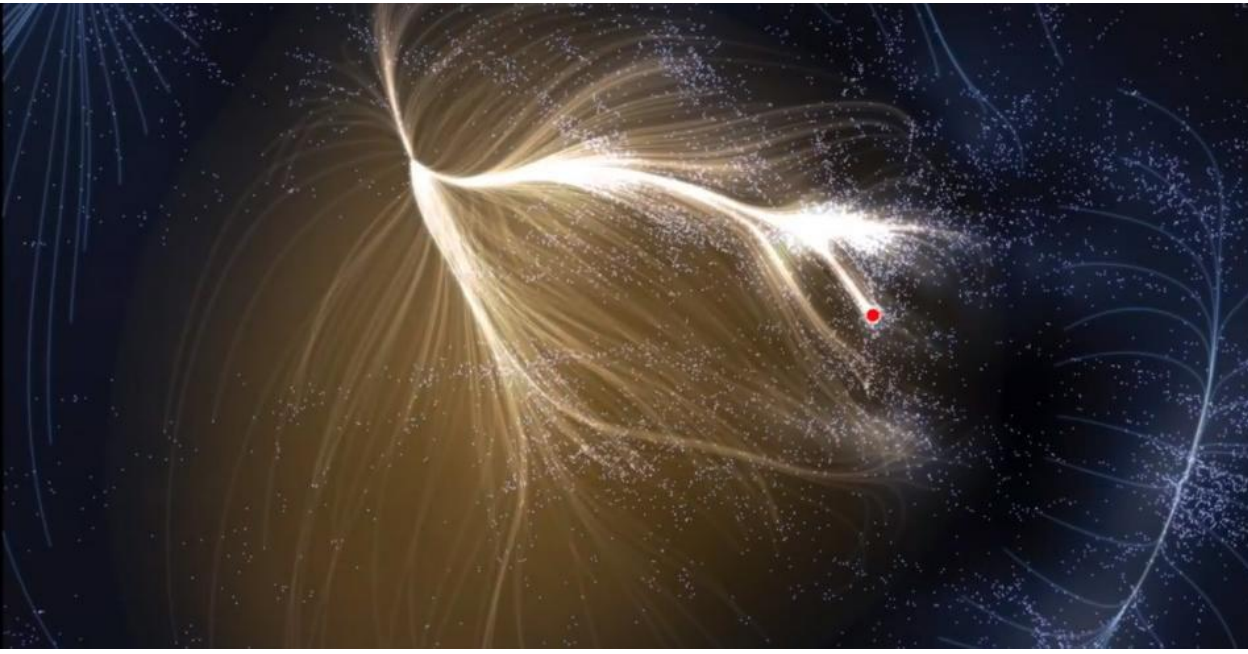

ল্যানিয়াকিয়া : আমরা যেখানে বসবাস করি

আবিরা আফরোজ মুনা

আজ আলোচনা করব ল্যানিয়াকিয়া নিয়ে। ‘হাওয়াই’ ভাষায় ল্যানিয়াকিয়া শব্দের মানে হচ্ছে ‘অমিত স্বর্গ’। *ল্যানি* মানে হচ্ছে স্বর্গ আর *আকেয়া* মানে হচ্ছে মহাকায়, অপরিমেয়। ল্যানিয়াকিয়া হলো একটি গ্যালাক্সি-মহাপুঞ্জ। অনেকগুলো গ্যালাক্সি মিলে এই গ্যালাক্সি-মহাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সি সুপার ক্লাস্টার গঠন করে। আমাদের গ্যালাক্সিটি যে সুপার-ক্লাস্টারটিতে (গ্যালাক্সি-মহাপুঞ্জ) রয়েছে তার নামই ল্যানিয়াকিয়া।

অনেকগুলো নক্ষত্র মিলে যেভাবে একটি গ্যালাক্সি গঠন করে সেরকমভাবে গ্যালাক্সিগুলো বড়ো আকারের দল বা গুচ্ছ গঠন করে। পুরো মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে যেন এক ত্রিমাত্রিক মহাজাগতিক জাল। এর কিছু কিছু অংশকে আমরা তাদের অবস্থান, দূরত্ব ও

পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে গ্যালাক্সিগুচ্ছ বলে ধরে নিতে পারি। অসংখ্য গ্যালাক্সি মিলে গঠন করতে পারে একটি গ্যালাক্সি-গ্রুপ। আমাদের গ্যালাক্সি-গ্রুপের নাম লোকাল-গ্রুপ। কয়েক দশক আগ থেকে ধারণা ছিল আমাদের লোকাল-গ্রুপসহ আরো অসংখ্য গ্যালাক্সি-গ্রুপ নিয়ে ভার্গো নামক গ্যালাক্সি-মহাপুঞ্জ গঠিত। পরে ২০১৪ সালের দিকে এসে দেখা গেল এই ভার্গো আসলে তার থেকে শতগুণ বড় ল্যানিয়াকিয়া নামক গ্যালাক্সি-মহাপুঞ্জের অংশ। এখন পর্যন্ত গ্যালাক্সি-মহাপুঞ্জই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড়ো কাঠামো।

ল্যানিয়াকিয়ার ব্যাস ৫০ কোটি আলোকবর্ষ এবং তাতে প্রায় এক লক্ষ গ্যালাক্সি রয়েছে। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর ব্রেন্ট টালি এবং লিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলেনে কোর্টোয়েসের দল গ্যালাক্সিগুলোর আপেক্ষিক বেগ অনুসারে গ্যালাক্সি-মহাপুঞ্জ নির্ধারণের নতুন পন্থা বের করেন যা প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আর এর মধ্যে দিয়েই শনাক্ত করা হয় ল্যানিয়াকিয়া, তৈরি করা হয় এর মানচিত্র।

গ্যালাক্সিগুলোকে ছোটোছোটো বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করলে তা বিভিন্ন আকারের ত্রিমাত্রিক কাঠামো তৈরি করে, এগুলোকে ছোটো পরিসরে দেখার চেষ্টা করলে অসংখ্য ডট বা বিন্দুর সমাহার বলে মনে হবে যেখানে একেকটি ডট বা বিন্দু একেকটি গ্যালাক্সি।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে অসংখ্য গ্যালাক্সির এই সমাহার থেকে কোন অংশটি ল্যানিয়াকিয়া তা কীভাবে নির্ধারণ করা হলো? ধরুন, আমাদের সূর্যকে দেখা সম্ভব নয় কোনো কারণে। তাহলে কি আমরা সূর্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারব? অবশ্যই পারব, শুধু অস্তিত্ব নয় বরং সূর্য কত দূরে আছে, এর ভর কত থেকে আরম্ভ করে বেশির ভাগ তথ্যই উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। প্রথমেই যখন দেখা যাবে গ্রহগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটা বস্তুর চারদিকে ঘুরছে, তখনই অতিসহজে আমরা বুঝতে পারব কেন্দ্রে গ্রহগুলোর তুলনায় অনেক ভারী কোনো একটা বস্তু আছে। এভাবে কোনো একটি ভারীবস্তুর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানা সম্ভব এর আশেপাশের বস্তুগুলোর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ঘণ্টায় ২২ লক্ষ কিলোমিটার বেগে ছুটছে একটি নির্দিষ্ট দিকে। কিন্তু কোন দিকে ছুটছে আর কেন? বিভিন্ন হিসাবনিকাশ থেকে দেখা যায় মহাজাগতিক

সম্প্রসারণের তুলনায় এ বেগ বেশ অপ্রত্যাশিত। আরো দেখা গেল আশেপাশের অন্যান্য গ্যালাক্সিগুলোও একই দিকে ছুটছে। পর্যবেক্ষণ ও হিসাব থেকে দেখা গেল আমাদের থেকে ১৫ কোটি আলোক বর্ষ দূরের বিশাল ভরের কোনো বস্তু এদেরকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। এর নাম দেয়া হল Great-attractor বা মহা-আকর্ষক। এই মহা-আকর্ষকের দিকে ধাবমান সকল গ্যালাক্সি মিলে একটি মহা-পুঞ্জ গঠন করেছে ধরে নেওয়া যায়। আর এটিই ল্যানিয়াকিয়া!

মহা-আকর্ষক ল্যানিয়াকিয়াকে সাথে নিয়ে পাশের বিশাল ভরের গ্যালাক্সি-মহাপুঞ্জ শাপলির দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। অতিসম্প্রতি মহা-আকর্ষকের উপর কিছু গভীর পর্যবেক্ষণের ফলে বেশ কিছু নতুন গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে। যাইহোক, যেসব গ্যালাক্সি মহা-আকর্ষকের দিকে ধাবিত না হয়ে বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা নিশ্চয়ই ভিন্ন কোনো মহাপুঞ্জের অংশ। যেভাবে পানির প্রবাহ দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে ভিন্ন দিকে যাত্রা করে সেভাবেই গ্যালাক্সিগুলো নিজ নিজ মহাপুঞ্জের গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে। এ থেকে আমরা সহজেই আলাদা করতে পারি অগণিত গ্যালাক্সি মেলার কোনগুলো ল্যানিয়াকিয়ার অংশ আর কোনগুলো ভিন্ন গ্যালাক্সিপুঞ্জের অংশ। ল্যানিয়াকিয়ার নিকটবর্তী গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জগুলোর নাম হচ্ছে শাপলি, পারসিয়াস পাইসিজ, হারকিউলিস, কোমা ইত্যাদি।

এক্সোপ্ল্যানেটে ঘুরাঘুরি

সাজ্জাদুর রহমান

প্রারম্ভিকা

আচ্ছা, সৌরজগতকে কেন সৌরজগত বলা হয়? এককথায় বলা যায়, "সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী মহাজাগতিক বস্তুগুলোর সমন্বয়ে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা"। মনের ছোট্টকোনায় প্রশ্ন কি জাগে, তারকাকেন্দ্রিক কোনো জগতের অস্তিত্ব আছে কি না? এ নিয়ে জানতেই আজকে আমাদের পথচলা।

বক্সিং কোর্ট। একপাশে সাতফুটি এক পালোয়ান আরেকপাশে হ্যাংলা-পাতলা এক চুনোপুঁটি। এখানে তো বলতেও হবে না লড়াইয়ে কে বিজয়ী হবে! এরকমটিই ঘটে যখন প্রবল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অধিকারী বিশালাকার তারকার অপরপাশে ক্ষুদ্রাকার কম মহাকর্ষীয় শক্তির গ্রহ থাকে। ফলে গ্রহটি তারকাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান হয়। তারকারাজিকে কেন্দ্র করে এই ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলোকে নিয়েই তারকাজগত গঠিত। এদেরকে এক্সট্রাসোলার প্ল্যানেট অথবা বাহ্যগ্রহও বলা হয়ে থাকে। ১৯১৭ সালে একটি এক্সোপ্ল্যানেটের সম্ভাব্যপ্রমাণ [1] পাওয়া গেলেও তার স্বীকৃতি আসতে আসতে হয়েছিল ১৯৯২ সাল। এর আগে ১৯৮৮ সালে ভিন্ন আরেকটি

এক্সোপ্ল্যানেটের প্রমাণ নিশ্চিত হয়েছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর তথ্যানুযায়ী বর্তমানে ৩৫৭৪টি গ্রহমণ্ডলে ৪৮৩৬টি গ্রহ আছে এবং ৭৯৫টি গ্রহমণ্ডলে একাধিক গ্রহ রয়েছে [2]।

এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত পাঁচটি নিয়েই আমরা গল্প করব। তাহলে শুরু করা যাক।

পাঁচ পদ্ধতির শনাক্তকরণ [3]

প্রথমে এক নজরে সবগুলো দেখে নিই।

1. রেডিয়াল ভেলোসিটি বা রশ্মীয় গতিবেগ।
2. ট্রানজিট বা গ্রহ-গমন।
3. ডিরেক্ট ইমেজিং বা স্পষ্ট ছবিকরণ।
4. গ্র্যাভিটেশনাল মাইক্রোলেন্সিং বা মহাকর্ষীয় মাইক্রোলেন্সিং।
5. অ্যাস্ট্রোমেট্রি বা জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পরিমাপ।

রেডিয়াল ভেলোসিটি

এটি প্রথমদিককার সফল এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতিগুলোর অন্যতম। অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে আবিষ্কৃত গ্রহগুলোকেও এই পদ্ধতি দ্বারা যাচাই করা হয়।

তারকাজগতে থাকা গ্রহ তারাকে কক্ষপথে ঘুরাতে কারণের ভূমিকায় থাকে। অর্থাৎ গ্রহ তারাকে প্রদক্ষিণ করার কারণে তারাতেও আন্দোলন তৈরি হয়, বৃহস্পতির মতো বড়ো গ্রহগুলো বৃহৎপ্রভাব ফেলে অন্যদিকে পৃথিবীর মতো ছোটোগুলো কম। যেহেতু গ্রহটি টলমলভাবে এদিকওদিক চলতে থাকে ফলে হালকা তরঙ্গগুলো চেপে আসে এবং আবার বিস্তৃত হয়। এভাবেই আমরা দূর আকাশে যে আলোকচ্ছটা দেখি তা পরিবর্তন হয়।

এই নড়বড়ে বা আন্দোলনরত তারাগুলো চিহ্নিত করতে ‘ডপলার শিফট’ একটি কার্যকরী পদ্ধতি। দেড়শত বছর আগে পদার্থবিদ ডপলার এটি গবেষণা করে পেয়েছিলেন। আচ্ছা, আমরা তো পথেঘাটে কতই অ্যাম্বুলেন্স দেখি। যখন কাছাকাছি আসে তখন এর সাইরেন খুব জোরে কানে লাগে। আবার যখন ধীরে ধীরে দূরে যেতে থাকে তখন সাইরেনের আওয়াজও কমতে থাকে। এভাবেই যখন জ্বলমান তারাগুলো কাছাকাছি চলে আসে তখন তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যায়। আবার যখন তারাগুলো দূরে সরে যায় তখন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এভাবে যখন কোনো দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গমালা ছড়িয়ে পড়ে তখন তা দেখতে খানিকটা লালচে লাগে। বিজ্ঞানীরা এটি ব্যবহার করে মহাকাশের চলমান বস্তুগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেন।

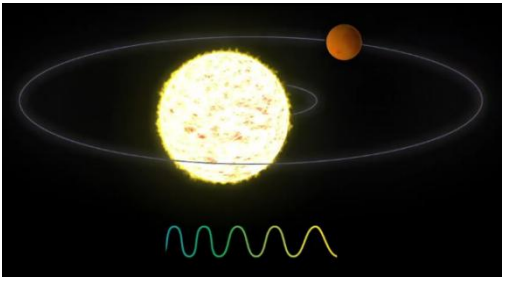

এই পদ্ধতি বিশ্বের অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা এবং টেলিস্কোপে এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত হাওয়াইয়ের 'দ্যা কেক টেলিস্কোপ' এবং চিলির 'লা সিলা মানমন্দির'-এ। এটি ব্যবহার করে এখন পর্যন্ত ৮৭৮টি গ্রহ শনাক্ত করা হয়েছে।

ট্রানজিট মেথড

বিশ্বজগতের অন্যতম সুন্দর ঘটনা কি? কারো কি সূর্যগ্রহণের কথা মনে আসছে? যখন চাঁদ সরাসরি সূর্যের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে এর আলোকে আটকে দেয় তখনি সূর্যগ্রহণ ঘটে। ট্রানজিট মেথডটাও অনেকটা এরকমই।

যখন একটি গ্রহ কোনো পর্যবেক্ষক এবং তারার মধ্য দিয়ে যায় তখন এটি তারার আলোকে কিছুটা ঝিমিয়ে দেয়। আসলে তখন খানিকটা সময়ের জন্য তারাটি ম্লান হয়ে থাকে। এটি অল্প সময়ের জন্য হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এক্সোপ্ল্যানেটের অস্তিত্ব জানতে কিছুমাত্র বাকি থাকে না।

যে গ্রহ দ্বারা তারাটি স্তিমিত হয় তার আকারের উপর নির্ভর করে বেশকিছু জিনিস জানা যায়। যত বড়ো গ্রহ তত বেশী আলো আটকে রাখতে পারে। এর ফলে গভীরতর আলোক বক্ররেখা সৃষ্টি হয়। যখন একাধিক গ্রহ একটি তারার দিকে ছুটে তখন এই বক্ররেখাগুলো জটিলতর হয়। এক বা একাধিক গ্রহের মাধ্যমে তৈরি হওয়া বক্ররেখাগুলো একই ধরনের তথ্য নিয়ে আসে।

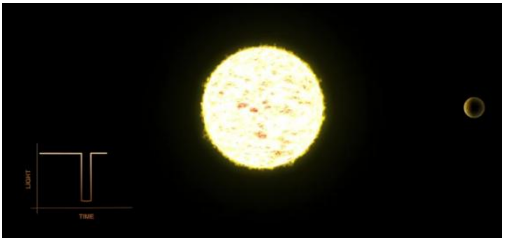

এই পদ্ধতি শুধু শনাক্তকরণের জন্যই প্রয়োজনীয় নয় বরং এটি দিয়ে গ্রহের তাপমাত্রা ও আবহাওয়া সম্পর্কেও জানা যায়। এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কারে এটি অবিশ্বাস্যভাবে সফল। ৩৪১২টি গ্রহ এর মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। নাসার কেপলার মিশন এই পদ্ধতি ব্যবহার করেই ২০০৯-২০১৩ মধ্যকার সময়ে হাজারো এক্সোপ্ল্যানেটের সম্ভাব্য প্রমাণ পেয়েছিল। গবেষকদের ছায়াপথে এক্সোপ্ল্যানেটের বিন্যাস নিয়ে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী দিয়ে বহুবিধ সাহায্য করেছিল।

ডিরেক্ট ইমেজিং

আকাশের তারকাগুলো অনেক উজ্জ্বল লাগে তবে এক্সোপ্ল্যানেটগুলো এরচেয়ে বহুগুণে অনুজ্জ্বল থাকে। তাই বৃহস্পতি কিংবা বুধ গ্রহের ছবি যেভাবে সহজে তোলা যায় এখানে সেভাবে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, সরাসরি ছবি তুলতে না পারার জন্য প্রধান সমস্যা হচ্ছে তারাটি প্রদক্ষিণরত গ্রহের চেয়ে উজ্জ্বলতর হয়। এক্সোপ্ল্যানেট থেকে প্রতিফলিত আলো কিংবা বিকিরিত তাপ তারা থেকে আসা উজ্জলতার কারণে হারিয়ে যায়। তবে দুইটি পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি ছবিও তোলা যায়।

প্রখর রোদে বাইরে যাওয়ার সময়ে আমরা আগে রোদচশমাটা চোখে লাগিয়ে নিই। এখানের কাজটিও এরকম। বিভিন্ন পদ্ধতি এবং ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা থেকে বিকিরিত আলোকে স্তিমিত করা হয় এবং এর ফলে তারার পার্শ্ববর্তী বস্তুগুলোর স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। সেগুলো হয়ত এক্সোপ্ল্যানেটও হতে পারে!

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে ক্রোনোগ্রাফি। এই পদ্ধতিতে টেলিস্কোপের ভেতরে আলোকে আটকানোর জন্য একধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। এতে করে তারা থেকে আগত আলো টেলিস্কোপের শনাক্তকারী জায়গায় আসতে পারে না। এই ক্রোনোগ্রাফ সাধারণত টেলিস্কোপে দেওয়া থাকে। ভূ-মানমন্দিরগুলো থেকে এক্সোপ্ল্যানেটের ছবি তুলতে এই পদ্ধতি বর্তমান।

আরেকটি ব্যবস্থা হচ্ছে 'ছায়াতারকা' ব্যবহার করা। তারা থেকে আগত শক্তিশালী রশ্মিকে আটকাতে এটির শুরু হয়েছে। এটিকে ডিজাইন করা হয় যেন সঠিক দূরত্ব এবং কোণে থেকে পর্যবেক্ষণীয় তারকা থেকে আগত তারকার আলোক রশ্মিকে আটকাতে পারে।

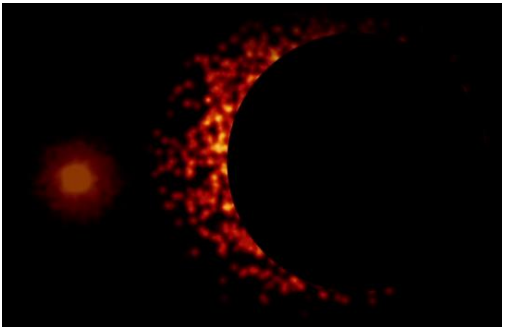

এটি এখনো উন্নতির পর্যায়ে রয়েছে। ৫৪টি গ্রহ এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আবিষ্কৃত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর শীঘ্রই উন্নয়ন হবে এবং ভবিষ্যতে এক্সোপ্ল্যানেটের আবহাওয়া বিন্যাস, সাগর কিংবা মহাদেশের অস্তিত্ব আছে কি না নির্ণয়ে ব্যবহৃত হবে।

গ্র্যাভিটেশনাল মাইক্রোলেন্সিং

কোনো কোনো তারকা বা গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ আরো দূরবর্তী অন্যকোনো তারকার আলোর দিকে ফোকাস করে। এই ফোকাসের কারণে সেটি সাময়িকভাবে উজ্জ্বল হয়। মোদ্দাকথা লেন্সিং হল দূরবর্তী কোনো তারকার মাস বা মাসাধিক কাল জুড়ে ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বলতার দিকে যাওয়ার গল্প। তারপর এটি বিবর্ণ হয়ে যায়। কোনো গ্রহকে লেন্স করা হলে সেটি দেখতে একটি ছোট্টআলোর

ঝলকানির মত হয় যেটি এই উজ্জ্বল হওয়া এবং স্তিমিত হওয়ার সময় ঘটে।

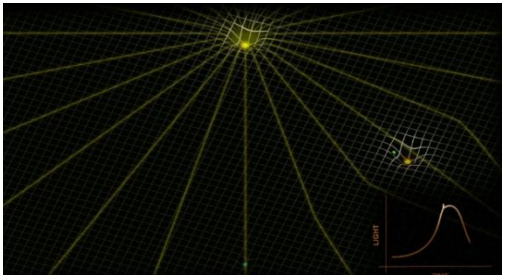

গ্রহে লেন্স করা হলে আলোর মাত্রা হ্রাস পায় তবে তারকার ক্রমাগত লেন্সিং কার্যক্রমের কারণে এটি বাড়তে থাকে। লেন্সিং তারকাটি যখন সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে তখন দূরবর্তী তারকাটির উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়। তবে এতসব কিছু নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়, তাই বিজ্ঞানীদের বহু সময় ব্যয় করে আকাশের বৃহদাংশ নজরে রাখতে হয়। কারণ কখন কোন অংশে লেন্সিং ঘটবে তা বুঝা দুঃসাধ্য। যখন তারা দেখতে পায় কোনো তারকা উজ্জ্বল হল এবং লেন্সিং বস্তুর প্যাটার্ন অনুযায়ী বিবর্ণও হল তখন সেই তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে তার আনুমানিক আকার সম্বন্ধে জানা যায়। এই মাধ্যমে ১১৪টি এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কৃত হয়েছে।

অ্যাস্ট্রোমেট্রি

ডপলার শিফট ছাড়াও বিজ্ঞানীগণ মহাকাশে ঘুরে বেড়ানো তারকারাজির অবস্থান শনাক্ত করতে পারেন। অ্যাস্ট্রোমেট্রি এরকমই একটি পদ্ধতি। তারকাগুলো খুবই কম দূরত্বে একে অপরের সাথে অবস্থান করে ফলে ছোট আকারের গ্রহগুলো যথার্থভাবে শনাক্ত করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

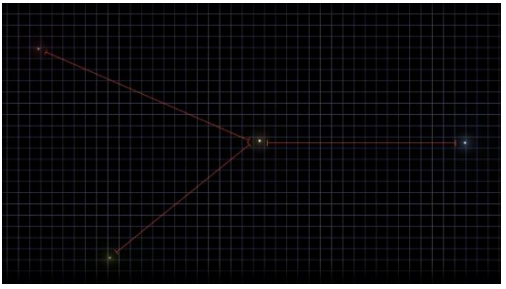

এই কাজটি করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি তারার ধারাবাহিক ছবি তুলেন এবং একই সাথে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য তারাগুলোরও ধারাবাহিক ছবি তুলেন। প্রতিটি ছবিতেই তাঁরা নির্বাচিত-তারার (এক্সোপ্ল্যানেট আছে এরকম সন্দেহযুক্ত) সাথে পার্শ্ববর্তী তারাগুলোর দূরত্ব তুলনা করেন। যদি নির্বাচিত তারাটি অন্যান্য তারাগুলোর সাথে সম্পর্কিত হয় তবে তারা এক্সোপ্ল্যানেটের লক্ষণ বুঝার জন্য তা বিশ্লেষণ করেন।

এই পদ্ধতিতে একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট অপটিক্স। বিশেষ করে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এই পরীক্ষণ কঠিনই বটে কেননা আমাদের বায়ুমণ্ডল আলোক রশ্মিকে বিকৃত করে এবং বাঁকিয়ে দেয়।

সমাপ্তি

এক্সোপ্ল্যানেটের ধারণা আমাদের ভবিষ্যতের নতুন অনেক সম্ভাবনাকে উসকে দেয়। বিশেষ করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গল্প, উপন্যাসের জন্য এটি জনপ্রিয় একটি বিষয়। অনেকে তো বলেও থাকে তাহলে হয়ত এলিয়েনও পাওয়া যাবে! সে যাইহোক, আমরা মহাকাশের এই রোমাঞ্চকর যাত্রার পথে উড়তে নিজেদের রকেটে শান দিতে থাকি।

তথ্যসূত্র

1. Jason T. Wright, B. Scott Gaudi, (2012 October 11). Exoplanet Detection Methods. (https://www.researchgate.net/publication/232063462_Exoplanet_Detection_Methods)
2. ESA Science & Technology - Exoplanet Detection Methods. (https://sci.esa.int/web/exoplanets/-/60655-detection-methods)
3. 5 Ways to Find a Planet | Explore – Exoplanet Exploration: Planets Beyond Our Solar System. (https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/ways-to-find-a-planet/)
4.Overlooked Treasure: The First Evidence of Exoplanets | NASA. (https://www.nasa.gov/feature/jpl/overlooked-treasure-the-first-evidence-of-exoplanets)
The Extrasolar Planet Encyclopedia — Catalog Listing. (http://exoplanet.eu/catalog/

[1] https://www.nasa.gov/feature/jpl/overlooked-treasure-the-first-evidence-of-exoplanets
[2] http://exoplanet.eu/catalog/
[3] https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/ways-to-find-a-planet/

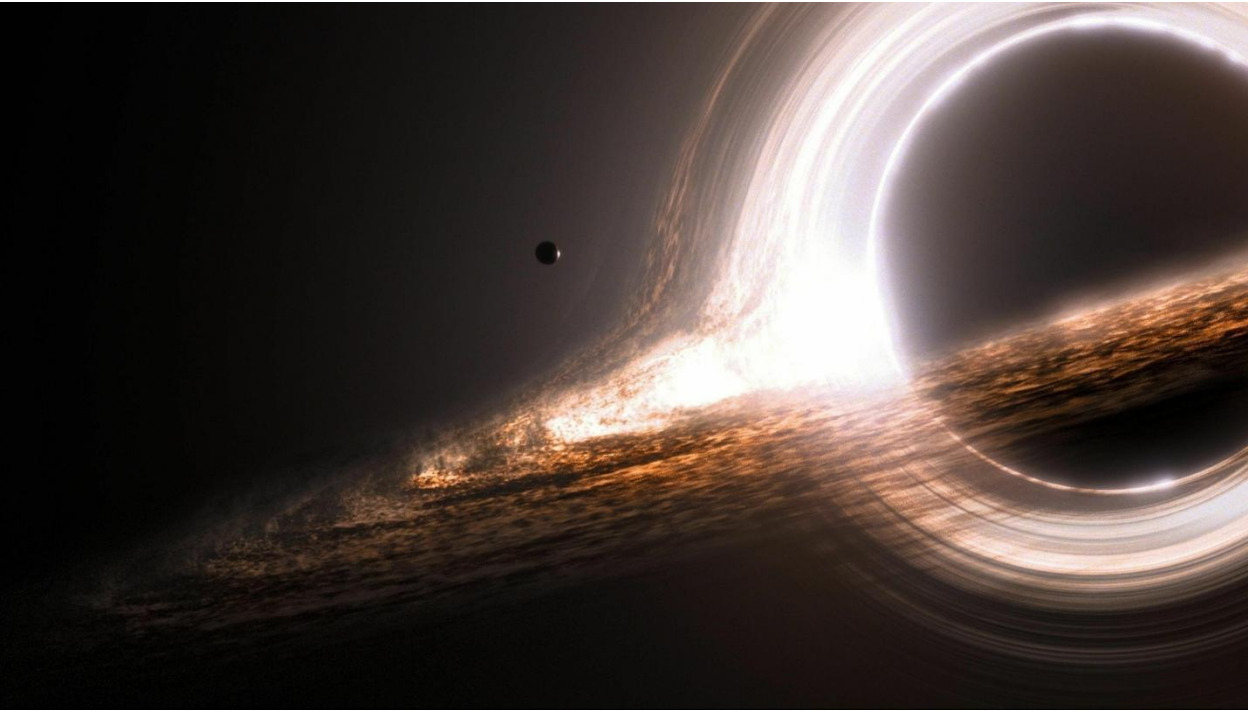

ব্ল্যাকহোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স

রুশলান রহমান দীপ্ত

ব্ল্যাকহোল কী?

ব্ল্যাকহোল, সাধারণ আপেক্ষিকতার আলোকে বলতে গেলে স্থান-কালের এমন এক ঘটনা (event) যেখানে সময় সম্প্রসারণ ও স্থানের একমাত্রিক প্রবাহের কারণে আলোর লোহিতসরণ (Red Shift) এত বেশি হয় যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে আমরা তা কালো এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখি।

কী? ব্ল্যাকহোলের সঙ্গা একটু অন্যরকম লাগল? একটু বুঝুন।

আমরা ভুল করি যখন আমরা ভাবি একটি ব্ল্যাকহোল গ্রহ-নক্ষত্রের মতো মহাকাশে ভাসমান কোন মহাজাগতিক বস্তু বা সত্তা। যাই বলেন, আসলে তা না; ব্ল্যাকহোল স্থান-কালের অংশ, শুধু স্থানের নয়। ব্ল্যাকহোল স্থান-কালের গর্তস্বরূপ। সহজভাবে সঙ্গায়িত করতে গিয়ে আমরা ভুল করে থাকি। সনাতন বলবিদ্যা অনুসারে ব্ল্যাকহোলের মুক্তিবেগ কাকতালীয়ভাবে আলোর বেগের সমান বা তার চেয়ে বেশি। কিন্তু আমদের মনে রাখতে হবে মহাকর্ষ বল সম্পর্কে নিউটন আমাদের যা শিখিয়েছেন তা কিন্তু প্রকৃত ঘটনা নয়।

বুঝতে সুবিধা যেন হয় তার জন্যই বলছি “ব্ল্যাকহোল হচ্ছে মহাবিশ্বের এমন একটি জায়গা

যেখানে মহাকর্ষ বলের মান এত বেশি যে আলোও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।" আবারও বলছি কথাটিতে ভুল রয়েছে। এটি গেল ব্ল্যাকহোলের পরিচয় সম্পর্কে।

মূল কথায় আসি।

আপনার পরিচিত এমন কেউ কি আছে যার এতই ক্ষুধা লাগে যে সকালে কী খেয়েছে দুপুরেই তা মনে থাকে না! যদি থাকে এমন পরিচিত, তবে তার সাথে আমাদের এই ব্ল্যাকহোলের দিব্যি মিল রয়েছে। একটি অতি ভারী নক্ষত্রের যখন মৃত্যু হয় তখন সে তার বাহিরের গ্যাসীয় আবরণকে মহাকাশে ছুড়ে ফেলে দেয়। শুধু বাকি থাকে তার কেন্দ্রক বা Core। যেখানে ভারী মৌলগুলো জমা পড়ে থাকে। এই কোরের ভর যদি সূর্যের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বা তার চেয়ে বেশি ভারী হয়ে থাকে তাহলে তা নিজেরই সৃষ্ট মহাকর্ষ বলের কারণে তার ভরকেন্দ্রের দিকে পতিত হতে থাকবে। এই মহাকর্ষের আকর্ষণ এত বেশি হয়ে থাকে যে প্রকৃতির কোনো চেনাজানা বলের পক্ষে আর সম্ভব হয় না এই পতন ঠেকাবে। এক সময় নির্মাণ হয় প্রায় অসীম ঘনত্ব বিশিষ্ট ব্ল্যাকহোলের। কিন্তু জানেন কি এর ক্ষুধা এতই বেশি যে, এটি যা তার অভ্যন্তরে একবার প্রবেশ করায় তার কোনো বৈশিষ্ট্যই এটি মনে রাখে না।

৩টি বৈশিষ্ট্য ছাড়া -

১। ভর

২। ইলেকট্রিক চার্জ

৩। কৌনিক ভরবেগ

একে "No Hair Theorem"-ও বলে। অর্থাৎ ব্ল্যাকহোলের কোন চুল নেই! অবশ্য তিনটি চুল ছাড়া।

মনে করে দেখুন ব্ল্যাকহোলটি এক সময় একটি নক্ষত্র ছিল। সেই নক্ষত্রের রৈখিক ভরবেগ ছিল, উজ্জ্বলতা ছিল, ব্যাসার্ধ ছিল, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, আয়তন ছিল। কিন্তু এখন তার উপরিউক্ত ৩টি বৈশিষ্ট্য ছাড়া কিচ্ছু নেই। শুধু তাই নয় যদি ভুলে কোনো বস্তু এর ভেতর প্রবেশ করেও তার কোনো বৈশিষ্ট্য আমরা আর জানতে পারবো না। ধরুন একটা বই ঢেলে দিলেন ব্ল্যাকহোলের ভেতর। আপনি কস্মিনকালেও জানতে পারবেন না যে বইয়ের তাপমাত্রা কত ছিল, বই এ কী কী কণা ছিল, তাদের স্পিন কী ছিল, তার অভ্যন্তরীণ শক্তি কত ছিল। বইটি সম্পর্কিত যত তথ্য ছিল আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। বইয়ের ভর, চার্জ আর কৌণিক ভরবেগ বাদে। বইটি ফেলার পূর্বে আর পরে ব্ল্যাকহোলের বাহ্যিক অবস্থা দেখে আপনি বলে দিতে পারবেন বইটির ভর, চার্জ আর কৌনিক ভরবেগ।

এই যে এই ৩টি বৈশিষ্ট্য ছাড়া আপনার বইটি সম্পর্কে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, এই যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যগুলো মুছে গেছে

মনে হওয়ার পরিস্থিতিকেই "ব্ল্যাকহোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স" বলে।

কিন্তু এখানে প্যারাডক্স কই?

প্যারাডক্স দাঁড় করায় কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মতে "ইনফরমেশন বা তথ্য সবসময় সংরক্ষিত থাকে, একে শূন্য থেকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। একই তথ্যের দুটি প্রতিলিপিও সম্ভব নয়"। পরিপূর্ণ সঠিক ভাবে যদি বলি তবে তা এমন হবে যে,

মহাবিশ্বের প্রতিটি কণার বর্তমান স্টেট সম্পর্কে আপনি যদি জানতে পারতেন তবে আপনি মহাবিশ্বের অতীতের অবস্থা সম্পর্কেও বলে দিতে পারতেন। কিন্তু ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। ব্ল্যাকহোলে পর্যাপ্ত তথ্যই থাকে না যা দিয়ে আপনি এর অতীত সম্পর্কে বলবেন।

প্রশ্ন করতে পারেন যে "এমনও তো হতে পারে যে ইনফরমেশন ব্ল্যাকহোলের ভেতর ভালোভাবে সংরক্ষিত আছে কিন্তু আমরা তার নাগাল পাই না?"

আপনার কথা ঠিক ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না স্টিফেন হকিং সর্বপ্রথম মানবজাতিকে জানালেন তার একটি গবেষণার কথা। তিনি বললেন ব্ল্যাকহোল প্রতিনিয়ত বিকিরণ করে আর এর দরুন এটি প্রতিনিয়ত ভর হারায়। এমন এক সময় আসবে যখন এটি তার সব ভর, রেডিয়েশনের দরুন হারিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ফলে আমরা আর ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব খুঁজেও পাব না আর পূর্বে তার ভেতর পতিতবস্তু সম্পর্কিত তথ্য তো দূরে থাক।

তাহলে ইনফরমেশন কোথায় যায়?

বিজ্ঞানীমহলে এ নিয়ে আছে নানা তর্কবিতর্ক। নিচে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর এবং তাদের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হলো -

- ✧ কিছু বিজ্ঞানীর অভিমত ইনফরমেশন ব্ল্যাকহোলে পতিত হলেও এটি বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে যে তা ব্ল্যাকহোলে পতিত হয় নি। আমরা যারা ব্ল্যাকহোলের বাইরে আছি তারা কিন্তু ব্ল্যাকহোলের ভেতর কিছু ফেললে দেখবো জিনিসটা যতই ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি যাচ্ছে ততই আস্তে আস্তে তা স্থির হয়ে যাচ্ছে এবং এমন করে একসময় তা ব্ল্যাকহোলের "ঘটনা দিগন্ত"-এর উপরে আসতেই মনে হবে জিনিসটা বুঝি আটকে গেল। কিন্তু যে জিনিসটা ফেলা হলো তার সাপেক্ষে কিন্তু ঠিকই সে ব্ল্যাকহোলে পড়ে দুমড়েমুচড়ে গেছে। অর্থাৎ ২ জন এর মতামত ভিন্ন হবে একে অন্যের থেকে।

আর এখানেই সমাধান। বিজ্ঞানীরা বললেন ইনফরমেশনের একটি অবিকল কপি তৈরি হয় ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে। যার একটি কপি আমাদের মহাবিশ্বে ঘটনা দিগন্তের উপর থেকে যায় আর একটি কপি ব্ল্যাকহোলে পড়ে যায়। কিন্তু দাঁড়ান। প্রথমেই বলা হয়েছে ইনফরমেশন এর প্রতিলিপি সম্ভব নয়। একে "No Cloning Theorem" বলে। তাই একটি প্যারাডক্স দূর করতে গিয়ে আপনি আরেকটা প্যারাডক্স দাঁড় করাচ্ছেন বইকি।

✧ আরেকটি সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে হয়তো হকিং যে রেডিয়েশনের কথা বলতেছেন তার সাথে ইনফরমেশন বেরিয়ে যায়?

এটি সম্ভব নয়। হকিং যখন ব্ল্যাকহোলের রেডিয়েশনের সমীকরণ লিখেন তখন তিনি দেখেন তা কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের (Black body radiation) বর্ণালীর সাথে মিলে যায়। মোদ্দাকথা ব্ল্যাকহোল বিকিরণ করে বিশুদ্ধ তাপ যার বাহক ফোটন। এর এই ফোটন পূর্বে পতিত কোন বস্তু বা ব্ল্যাকহোলের পরিণত হওয়া নক্ষত্র সম্পর্কে কোনো তথ্য রাখে না। সব ফোটনের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই। ব্ল্যাকহোল যাই খেয়ে থাকুক না কেন একই রকমের ফোটনই নির্গত হবে।

✧ মাল্টিভার্স। আইনস্টাইন-কার্টার থিওরি অনুসারে একটি ঘূর্ণনশীল ব্ল্যাকহোল তার ভেতরে একটি ওয়ার্মহোলের নির্মাণ করে। হতে পারে পতিত হওয়া ইনফরমেশন এই ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে অন্য মহাবিশ্বে প্রবেশ করে।

✧ জ্যাকব বেকেনস্টাইন নামক এক বিজ্ঞানী তার হিসাব থেকে বলেন ব্ল্যাকহোল যত বস্তু নিজের মধ্যে টেনে নিতে থাকে ততই এর ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি একটু জটিল ধারণা। সহজে বলতে গেলে মহাবিশ্বের ত্রিমাত্রিক বস্তুর ইনফরমেশনগুলো ব্ল্যাকহোলের দ্বিমাত্রিক ঘটনা দিগন্তে লেপ্টে থাকে। মানে ধরুন আপনি একটি ত্রিমাত্রিক বার-চকলেটকে গলিয়ে একটি ফুটবলের উপর লেপ্টে দিলেন। নতুন একটি ধারণার উদ্ভব হয় এখান থেকে যে ত্রিমাত্রিক বস্তুর সব তথ্য, দ্বিমাত্রিক তলে প্রতিলিপিত হতে পারে। এখান থেকেই "Holographic Universe" -এর ধারণা আসে। অনেক বিজ্ঞানীর মতেই আমাদের এই বিশ্বজগৎ চতুর্মাত্রিক মহাবিশ্বের ত্রিমাত্রিক প্রতিরূপ।

মোটকথা এতসব সমাধানের প্রত্যেকটিরই তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের এই নতুন অথবা পুরাতন সমস্যার আজও কোনো সন্তোষজনক উত্তর নেই। কাজে লেগে পড়ুন, হয়ত পরবর্তী নোবেল প্রাইজটা আপনার বাড়িতেই যাবে।

এটি চিত্র শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগের আঁকা যার নাম ‘দ্যা স্টারি নাইট’। একে গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যেও এঁকেছেন একজন শিল্পী। সমীকরণের সাহায্যে আঁকা চিত্রটি দেখতে চলে যান এখানে
https://www.desmos.com/calculator/zx7cbldsuw

THE STARRY NIGHT

আবিরা আফরোজ মুনা

চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ এক নাম ভিনসেন্ট ভ্যান গগ। তার জন্ম ১৮৫৭ সালে হল্যান্ডের এক ছোট্ট গ্রামে। ভিনসেন্ট ভ্যান গগ তার জীবনকালের প্রায় শেষের দিকে ‘দ্যা স্টারি নাইট’ ছবিটি এঁকেছিলেন। এই ছবিটা আঁকার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আত্মহত্যার মাধ্যমে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন; আর রেখে যান তার কিছু অমর কীর্তি। তার এমনই এক অমরকীর্তি 'স্টারি নাইট' ছবিটি নিজের সৌন্দর্য, রহস্য আর বিজ্ঞানে ভাবিয়ে

তুলেছে গবেষকদের। এই নিয়েই কিছুকিছু জানা যাক!

গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে ভ্যান গগ তার শিল্পের মাধ্যমে যেন এক বৈজ্ঞানিক রহস্য সমাধান করেছেন। ছবিটির জটিল বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, ভ্যান গগ চিত্রের ক্যানভাসের উপরে আলোর তীব্রতা অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত করে আলোর গতির জন্য ছবি দেখার প্রতিনিধিত্ব করেছে। দেখে মনে হয় যেন শুধু আলোর উপস্থিতি নয়, তার গতিপ্রকৃতিকেও ক্যানভাসবন্দি করার চেষ্টায় ছিলেন তিনি। ঝিকিমিকি করা তারার আলো আর রাতের ঘন নীল আকাশে নরম সাদা আলোকতরঙ্গের মিশান প্রভাবটা তৈরি হয় লুমিনেসেন্স বা ঔজ্জ্বল্যের জন্য। আমাদের মাথার পেছনে মস্তিস্কের দৃশ্যপট প্রক্রিয়াকরণকারী যে অংশ রয়েছে, তাকে ভিজুয়াল কর্টেক্স বলা হয়। ভিজুয়াল কর্টেক্সের অপেক্ষাকৃত আদিম অংশটি আলোক বৈসাদৃশ্য বা কন্ট্রাস্ট আর গতি চিনতে পারে, তবে রং নয়। যদি দুটো ভিন্নরঙের ঔজ্জ্বল্য এক হয় তাহলে সে দুটোকে মিশিয়ে ফেলে। কিন্তু আমাদের মস্তিস্কের যে primate subdivision রয়েছে, সেটা কোনোরকম মিশান ছাড়াই আলাদা দুটো রঙ দেখতে পারে। মস্তিস্কের এই দুটো অংশ যখন একই সাথে প্রক্রিয়া করতে থাকে, তখন চিত্রে আলোর কাজগুলো দেখলে মনে হয় যেন তা কম্পমান, ঝিকিমিক করছে, বিচিত্রভাবে বিকিরিত হচ্ছে। ক্যানভাসে ব্যবহৃত রঙের মধ্যে আলোর তীব্রতার কারণে যে লুমিনেসেন্স বা উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়েছে তার কারণে ভ্যান গগ তার এই অমরসৃষ্টিতে তুলির আঁচড়ে অদ্ভুতরকম বাস্তব আলোর চঞ্চলতাময় প্রকৃতির চিত্র অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন!

টারবুলেন্সের সম্পূর্ন ব্যাখ্যা এখনও পদার্থবিদ্যার অমিমাংসিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। টার্বুলেন্স প্রবাহ বা তরল আলোড়নে বড়ো ঘূর্ণি ছোটো ঘূর্ণিতে শক্তি সঞ্চারন করে, যেটা একইভাবে সঞ্চারণ করে আরো ভিন্ন আকারের ঘূর্ণিতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বৃহস্পতি গ্রহের বিশাল লোহিতফোটা বা The Great Red Spot, আকাশে মেঘের আকার এবং মহাজাগতিক ধূলিকণা।

বৃহস্পতির রেড জায়ান্ট স্পট

রুশ গণিতবিদ আন্দ্রেই কোলমোগরভ টার্বুলেন্সের ব্যাপারে আমাদের গাণিতিক সমঝোতাকে আরো এগিয়ে আনেন যখন তিনি প্রস্তাব করেন, আলোড়িত তরলে R দৈর্ঘ্যে যে শক্তি সেটি R(5/3)

এর সমানুপাতিক। পরীক্ষাগারে পরিমাপ করে দেখা গেছে কলমোগরভ আলোড়িত স্রোত কীভাবে কাজ করে। তার সমাধানে তিনি খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন কিন্তু তা এখনও অসম্পূর্ন।

২০০৪ সালে, হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান এক নক্ষত্রের চারপাশে অবস্থিত ধূলিমেঘ আর গ্যাসের ঘূর্ণি। যা তাদেরকে ভ্যান গগের 'স্টারি নাইট'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

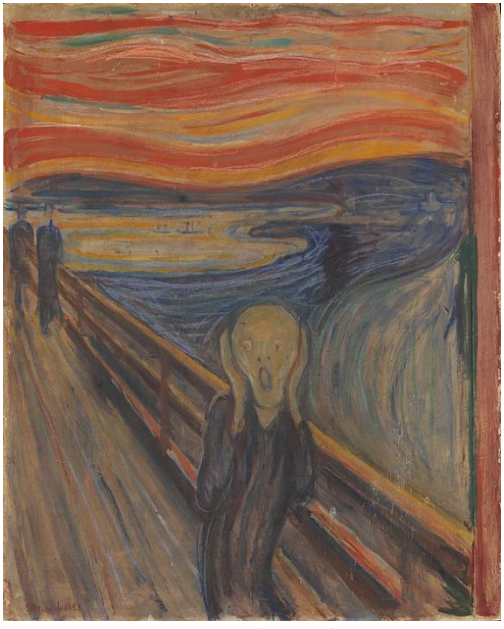

ভ্যান গগের আঁকা দ্যা স্ক্রিম

মেক্সিকো স্পেন আর ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা ভ্যান গগের ছবির ঔজ্জ্বল্য পরীক্ষায় আগ্রহী হন। তারা আবিষ্কার করেন, কলমোগরভের সমীকরণের কাছাকাছি আলোড়িত তরলের কাঠামোর বিশেষ প্রকৃতি ভ্যান গগের অনেক চিত্রে লুকিয়ে আছে। গবেষকরা চিত্রগুলোকে ডিজিটালাইজ করে যে-কোনো দুটো পিক্সেলের মধ্যবর্তী উজ্জ্বলতার তারতম্য পরিমাপ করেন। পিক্সেল পার্থক্যের চার্ট থেকে তারা সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভ্যানগগের মনবিকারগ্রস্ত সময়ের চিত্রগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে তরল আলোড়ন বা টার্বুলেন্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। যেমন *'পাইপ মুখে আত্মপ্রতিকৃতি'* ছবিটি, তার অপেক্ষাকৃত শান্ত পর্যায়ের জীবনের ছবি। এই ছবিটিতে পাইপের ধোঁয়ায় টার্বুলেন্স অনুপস্থিত। আবার মাঙ্কের *'দ্য স্ক্রিম'* ছবিটাতে কিন্তু টার্বুলেন্স রয়েছে, যা কিনা একটু অশান্ত প্রকৃতির দেখতে। ভিনসেন্ট ভ্যান গগের মনের অশান্তি যেন তাকে একটি দুর্দান্ত আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করেছে। শিল্পতেও যে বিজ্ঞান লুকিয়ে থাকতে পারে ভ্যান গগ তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছে।

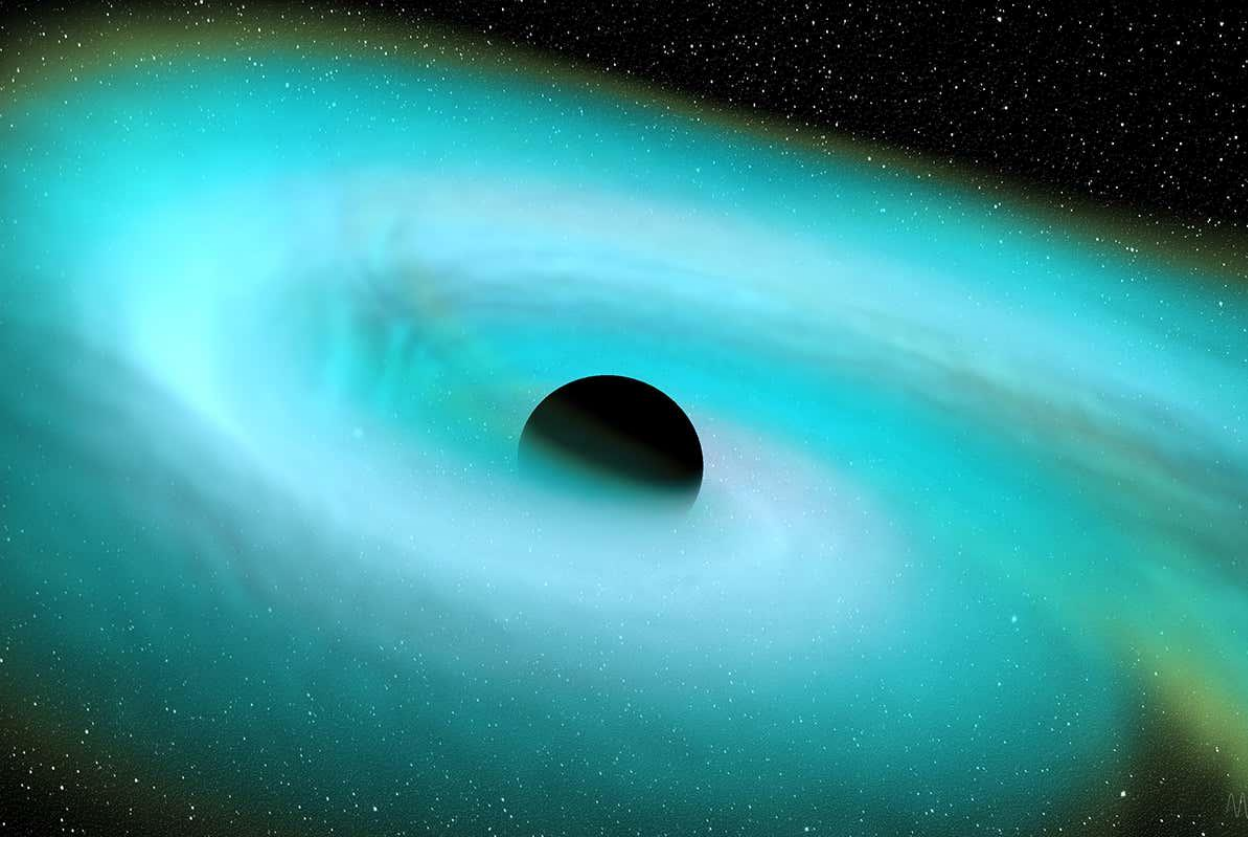

নিউট্রন-তারাকে গিলে খেলো ব্ল্যাকহোল

নুসরাত জাহান

২০২০ সালের জানুয়ারিতে জ্যোতির্বিদরা স্পষ্টভাবে একটি ব্ল্যাকহোল এবং একটি নিউট্রন-স্টারের সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ঘটনার ১০ দিন পর আরেকটি দূরবর্তী স্থানে তারা ওই একই ঘটনা পুনরায় প্রত্যক্ষ করেন। উল্লেখ্য, একটি নক্ষত্রের ভর যদি অত্যন্ত বেশি হয় তবে তা নিজ মহাকর্ষের ফলেই সংকুচিত হয়ে যায় ও এর বস্তু আকর্ষণ করার ক্ষমতা খুবই বেড়ে যায়। এতটুকু বেড়ে যায় যে, এর আকর্ষণ থেকে আলোও বের হতে পারে না। এধরনের বস্তুকে ব্ল্যাকহোল বলে। অন্যদিকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভর না থাকে তবে তা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে পারে না। তখন তা নিউট্রন-স্টারে পরিণত হয়।

জ্যোতির্বিদ্যায় এরূপ সফলতার বিষয়টি মাত্র কিছুদিন আগে *অ্যাস্ট্রোফিজিকাল জার্নাল লেটার্সে* প্রকাশিত হয়। এই শাখাটি জ্যোতির্বিদ্যার সাম্প্রতিক গড়ে ওঠা শাখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নতুন যার কাজ মহাজাগতিক বিপর্যয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা যেগুলো মহাবিশ্বের সংকোচন এবং প্রসারণে প্রভাব ফেলছে।

উইসকন্সিন - মিলওয়াকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং LIGO Scientific Collaboration-এর মুখপাত্র প্যাট্রিক ব্রাডি বলেন, এটাই সর্বপ্রথম যে আমরা, একটি ব্ল্যাকহোল এবং একটি নিউট্রন-স্টারের সংঘর্ষ শনাক্ত করতে পেরেছি। জ্যোতির্বিদদের ধারণা ছিল ব্ল্যাকহোল এবং নিউট্রন-স্টারের সংঘর্ষের ঘটনা প্রকৃতিতে বিদ্যমান তবে তাদের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ ছিল না। এই ঘটনাটি মহাবিশ্বের বাইনারি স্টার-সিস্টেমের ধারণাটিকে সুদৃঢ় করেছে। পাশাপাশি আমাদের মিল্কিওয়েতে কেন এখনো পর্যন্ত এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় নি সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বাইনারি স্টার-সিস্টেম হলো, যখন একটি সিস্টেমের কেন্দ্রে একটি নক্ষত্র না থেকে দুইটি নক্ষত্র অবস্থান করে, তখন যে সিস্টেম গঠিত হয় তা।

গত ২০ বছর ধরে LIGO (Laser Interferometer Gravitational - wave Observatory) এ ধরনের ঘটনা শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। কেননা এর সাহায্যে আইন্সটাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেও লাইগোর দুটি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র, হ্যান্ডফোর্ড এবং লিভিংস্টোনের লেজার বিমগুলো কোনো কিছুই শনাক্ত করতে পারেনি।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে লাইগোর দুটো পর্যবেক্ষণকেন্দ্রই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। সেই তরঙ্গ সংকেতটি দুটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। যেগুলো একে অপরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে একসময় একিসাথে মিশে গিয়ে একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়েছিল।

এর ২ বছর পর ২০১৭ সালে, লাইগো দুটি নিউট্রন নক্ষত্রের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়টি শনাক্ত করে। সংঘর্ষের পর অবশিষ্টাংশটির ঘনত্ব ছিল সূর্যের চেয়েও বেশি তবে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হওয়ার মতো যথেষ্ট বড়ো ছিল না। মহাবিশ্বে সোনা এবং রুপার বেশিরভাগ অংশ সৃষ্টি হয় এরূপ সংঘর্ষগুলোর মাধ্যমেই। ইতালিতে অবস্থিত VIRGO-এর (লাইগোর চেয়ে ছোটো একটি ইউরোপিয়ান পর্যবেক্ষণকেন্দ্র) সাহায্য নিয়ে জ্যোতির্বিদরা সংঘর্ষের স্থানটি শনাক্ত করতে সক্ষম হন।

জ্যোতির্বিদরা দীর্ঘদিন ধরে একটি ব্ল্যাকহোল এবং একটি নিউট্রন-স্টারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পরেও তারা এমনটি কেন দেখতে পাননি তা একটি বড়োরহস্য।

২০১৯ সালে শেষ অবদি তারা দুটি সন্দেহজনক তরঙ্গ শনাক্ত করেন। যার প্রথমটি শনাক্ত করা হয় এপ্রিল, ২০১৯-এ। এটি তাদের তদন্তের আওতায় ছিল না এবং এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন জ্যোতির্বিদগণ। যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় এটিকে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় শনাক্তকরণ হয় আগস্ট ২০১৯ এ। এখানে সংঘর্ষকারীদের মধ্যে বড়োটি অবশ্যই ব্ল্যাকহোল তবে ছোটোটি নিউট্রন-স্টার না কি ব্ল্যাকহোল তা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এটি ছিল প্রায় ২.৬ সৌরভরের যা এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা সকল ব্ল্যাকহোলের চেয়ে ছোটো এবং সকল নিউট্রন-স্টার থেকে বড়ো। তাই এটিকেও ব্ল্যাকহোল-নিউট্রন-স্টার জুটি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়নি। নতুন পর্যবেক্ষণগুলো শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করে যে, নিউট্রন-স্টার এবং ব্ল্যাকহোলের জুটি সত্যিই রয়েছে যদিও তা মিল্কিওয়ে থেকে অনেক দূরে। ব্ল্যাকহোল এবং নিউট্রন-স্টারের সংঘর্ষের বিষয়টি সর্বপ্রথম শনাক্ত করা হয় ৫ জানুয়ারি, ২০২০ এ লিভিংস্টোনে। সে সময় হ্যান্ডফোর্ডের ব্যবস্থাপনাটি অস্থায়ীভাবে বন্ধ ছিল। এই সংঘর্ষের ব্ল্যাকহোলটি ছিল প্রায় ৯ সৌরভরের এবং নিউট্রন-স্টারটি ছিল প্রায় ২ সৌরভরের। এই ঘটনাটি ঘটে পৃথিবী থেকে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে।

এর মাত্র ১০ দিন পর ১৫ জানুয়ারি, ২০২০-এ হ্যান্ডফোর্ডের ব্যবস্থাপনাটি সচল করা হয় এবং একইসাথে তিনটি যন্ত্রই ব্ল্যাকহোল এবং নিউট্রন-স্টারের দ্বিতীয় সংঘর্ষটি নিশ্চিত করে। এবারের বস্তু দুটি ছিল কিছুটা হালকা। নিউট্রন স্টারটি ছিল প্রায় ১.৫ সৌরভরের এবং ব্ল্যাকহোলটি ছিল প্রায় ৬ সৌরভরের।

এই সংঘর্ষ দুটি শণাক্ত হওয়ার পর ড. ব্রাডি বলেছেন,

> উপস্থিত সকল প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি হলো, কেন এখনো পর্যন্ত মিল্কিওয়েতে একটিও ব্ল্যাকহোল-নিউট্রন-স্টার জুটি খুঁজে পাওয়া যায়নি? হতে পারে এটি অনুসন্ধানের ত্রুটি কিংবা এগুলো দ্রুতই মিশে গেছে এবং আমাদের গ্যালাক্সিতে আর অবশিষ্ট নেই। এটি এখন সত্যিই একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন।

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কত?

মোঃ আক্তারুজ্জামান

আমরা সৌরজগতের আটটি গ্রহের মধ্যে তৃতীয় গ্রহে বসবাস করি। এ গ্রহ অন্য আটটি গ্রহ থেকে বেশ খানিকটা ভিন্ন। এই ভিন্নতার ফলে এখানে বসবাস করা কিছু বুদ্ধিমান প্রাণী, অন্য গ্রহ নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটির সুযোগ পেয়েছে। এই ঘাঁটাঘাঁটির চর্চাকে আলাদাভাবে নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও অবদান রয়েছে এমন হাতেগোনা কিছু সংখ্যার মধ্যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধও রয়েছে। আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের যত হিসাব-নিকাশ দেখি তার প্রায় সবগুলোতেই গ্রহের ব্যাসার্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। মজার ব্যাপার হলো - আধুনিক যন্ত্রপাতি ডেভেলপ হওয়ারও বহু আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করে রেখেছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে। কিন্তু কীভাবে?

আল বিরুনির পদ্ধতি

ভূমিকা না করে তিনি যেভাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেছিলেন সেটা বলি। তার পদ্ধতি পুরোপুরি ত্রিকোণমিতির উপর নির্ভরশীল। অ্যাস্ট্রোল্যাব ব্যবহার করে কোনো বস্তুর উন্নতি কোণ নির্ণয় করা যায়। এভাবে ধরুণ কোনো একটি পাহাড়ের পাদদেশ হতে কিছুটা দূরে

পাহাড়ের উন্নতি কোণ পাওয়া গেলো θ_1 এবং পাহাড়ের দিকে d দূরত্ব দূরে উন্নতি কোণ পাওয়া গেলো θ_2 পাহাড়ের উচ্চতা h.

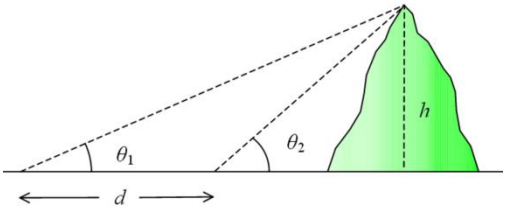

তাহলে ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে সহজেই পাওয়া যায়

$$h = \frac{d \tan\theta_1 \tan\theta_2}{\tan\theta_2 - \tan\theta_1}$$

এবার পাহাড়ের শীর্ষে উঠে কোণ α নির্ণয় করতে হয়। কোণ α কে বলা হয় বিনতি কোণ। এটিও Astrolabe দিয়ে নির্ণয় করতে হয়।

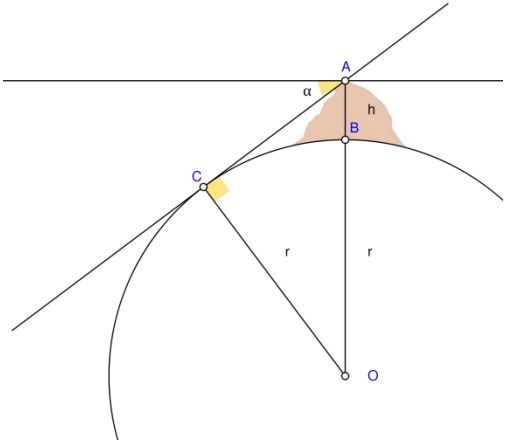

এই বিনতি কোণ α এবং B ও C পৃথিবীতে যে কোণ তৈরি করে তা সমান। এবার ACO সমকোণী ত্রিভুজ থেকে সহজেই R-এর মান বের করা যায়। সমকোণী ত্রিভুজ ACO তে OC = R (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ) এবং AO = R+h

$$\text{তাহলে, } \cos\angle AOC = \frac{OC}{AO}$$

$$\text{বা, } \cos\alpha = R/(R+h)$$

এবার এই সমীকরণে h এবং α-এর মান বসিয়ে সমাধান করলেই R-এর মান বা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পাওয়া যাবে।

আল বিরুনি তার এই পদ্ধতি আর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পেয়েছিলেন 3928.77 মাইল (প্রায়)। আর বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এই মান 3847.80 মাইল (প্রায়)। বোঝাই যাচ্ছে কতটা কাছাকাছি ছিল তার এই পরিমাপ। তবে যে ত্রুটিটা এসেছিল তার কারণ হলো পৃথিবীকে গোলকরূপে কল্পনা করা। পৃথিবী পুরোপুরি গোলক না। আবার অ্যাস্ট্রোল্যাবের সাহায্যে পরিমাপ করতে গেলে খালি চোখের পরিমাপে সামান্য পরিমান ত্রুটি আসতে পারে যেটা পৃথিবীর মতো এত বড় ব্যাসার্ধের জন্য বেশ ভালোই প্রভাব ফেলে। বলে রাখা ভালো বিরুনি অ্যাস্ট্রোল্যাব দিয়ে বিনতি কোণ মেপেছিলেন প্রায় ০ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট। বোঝাই যাচ্ছে কতটা ক্ষুদ্র। তাই এক্ষেত্রে ত্রুটি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর বিরুনি কিন্তু মাইল বা কিলোমিটার এককে এই পরিমাপটি করেননি। তিনি করেছিলেন কিউবিট এককে। এক কিউবিট =০.৪৫৭২ মিটার।

গ্যালাক্সির প্রকারভেদ

আবিরা আফরোজ মুনা

গ্যালাক্সি হচ্ছে ধূলিকণা, গ্যাস, ডার্ক ম্যাটার এবং কোথাও কোথাও এক মিলিয়ন থেকে এক ট্রিলিয়ন নক্ষত্রের মহাকর্ষ দ্বারা একত্রিত এক ব্যবস্থা। যতই আমরা মহাবিশ্বের গভীরে প্রবেশ করছি ততই নতুন এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের গ্যালাক্সির খোঁজ পাচ্ছি।

তবে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী 1920 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভেবেছিলেন মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিই আমাদের পুরো মহাবিশ্ব। এর বাইরের গ্যালাক্সিকে তখন তারা নেবুলা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল কারণ তাদেরকে মহাকাশীয় গ্যাসের মেঘ হিসেবে দেখা যেত। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবলই প্রথম দেখালেন যে মহাবিশ্বটি পূর্বের এই বিশ্বাসের চেয়ে অনেক অনেক বড়ো এবং তিনি ১৯২৫ সালের ১ জানুয়ারি, মিল্কিওয়ের বাইরে তাঁর গ্যালাক্সির আবিষ্কার উপস্থাপন করেন, যা কিনা মহাবিশ্ব সম্পর্কিত ধারণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে এবং তার পর্যবেক্ষণ বেশ কয়েকটি সর্পিল নীহারিকাতে গ্যালাকটিক এবং বহির্মুখী দূরত্ব (সেফয়েড ভেরিয়েবল হিসাবে পরিচিত) নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। তাঁর পর্যবেক্ষণগুলি প্রমাণ করেছে যে এই নীহারিকাগুলো মিল্কিওয়ের অংশ হতে খুব দূরে অবস্থিত ছিল। তারা আমাদের গ্যালাক্সিটির বাইরে নিজেদেরই সম্পূর্ণ ছায়াপথ হিসাবে পরিণত হয়েছিল।

এরপর 1936 সালে হাবল ছায়াপথগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করার একটি উপায় প্রকাশ করলেন। তিনি গ্যালাক্সিগুলোকে আকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রধান চার ভাগে বিভক্ত করলেন।

১. সর্পিল গ্যালাক্সি,
২. লেন্টিকুলার গ্যালাক্সি,
৩. উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি এবং
৪. অনিয়মিত গ্যালাক্সি।

প্রায় দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি পর্যবেক্ষণ করা গ্যালাক্সি হয় সর্পিল গ্যালাক্সি। সর্পিল ছায়াপথ দেখতে চ্যাপ্টা। ধীরে ধীরে এর চারপাশের স্ফীত চাকতিগুলো কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে পর্যাবৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। সব সর্পিল ছায়াপথের কেন্দ্রেই চাকতির মত উজ্জ্বল অংশ থাকে, যাকে বালজ (Bulge) বলা হয়। অনেকে একে গ্যালাকটিক কোরও বলে থাকেন। এর কেন্দ্রে নক্ষত্র, গ্যাস, ধূলিকণা, ডার্ক ম্যাটার এবং শক্তিশালী কৃষ্ণবিবর ধারণ করে। ১৯৩৬ সালে এডউইন হাবল তার গবেষণায় সর্বপ্রথম যে সর্পিল ছায়াপথের সন্ধান পান তা *"দি রেল্ম অব নেবুলা"*। আমাদের মিল্কিওয়েও একটি সর্পিল ছায়াপথ।

একটি উপবৃত্তাকার গোলক যার উজ্জ্বলতা কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি, ব্যাসার্ধ বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে তা উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি। এর কোনো ডিস্ক, স্পাইরাল বাহু নেই। গ্যাস এবং ধুলো কম থাকায় নতুন তারার জন্ম হয় না। নতুন তারা কম থাকায় এই ধরনের ছায়াপথের আয়নিত হাইড্রোজেন অঞ্চল নেই। মহাবিশ্বের ঘন অঞ্চলগুলোতে এরা বেশি থাকে। ছোটো-বড়ো ছায়াপথ গুচ্ছের মধ্যে থাকে। একেবারে বিচ্ছিন্ন ইলিপটিক্যাল ছায়াপথ খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাবিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছায়াপথগুলো উপবৃত্তাকার।

লেন্টিকুলার গ্যালাক্সিগুলি উপবৃত্তাকার এবং সর্পিল ছায়াপথগুলির মতো আইটোনিক সোম্বেরো গ্যালাক্সির মধ্যে বসে। এগুলিকে 'লেন্টিকুলার' বলা হয় কারণ নক্ষত্র লেন্সগুলির সাথে এরা সাদৃশ্যযুক্ত। সর্পিল ছায়াপথগুলির মতো এর নক্ষত্রগুলির একটি পাতলা, ঘোরানো ডিস্ক এবং একটি কেন্দ্রীয় বালজ রয়েছে তবে তাদের সর্পিল বাহু নেই। উপবৃত্তাকার ছায়াপথগুলির মতো এগুলির ধূলা এবং আন্তঃকোষীয় পদার্থ থাকে

এবং এগুলি স্থানের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রায়শই গঠিত হয় বলে মনে হয়।

যে ছায়াপথগুলি সর্পিল, লেন্টিকুলার বা উপবৃত্তাকার নয় তাদের অনিয়মিত ছায়াপথ বলে। অনিয়মিত ছায়াপথগুলি - যেমন আমাদের আকাশগঙ্গার মতোই বড়ো এবং এদের একটি স্বতন্ত্র রূপের অভাব দেখা যায়। প্রায়শই কারণ এগুলি অন্যান্য ছায়াপথগুলির মহাকর্ষীয় প্রভাবের নিকটে থাকে। এগুলি গ্যাস এবং ধূলায় পূর্ণ, যা তাদেরকে নতুন নক্ষত্র গঠন করতে সাহায্য করে।

গ্যালাক্সির প্রকারভেদ প্রকাশ করেন। তার সম্মানার্থেই এই ছককে The Hubble Tuning Fork নামে ডাকা হয়। চিত্রে হাবল সুরশলাকা নকশা দেখানো হয়েছে। হাবল টিউনিং ফর্কের মুলত দুইটি ভাগ। বাম পাশের একক হাতলের মতো অংশ দ্বারা উপবৃত্তাকার ছায়াপথ শ্রেণীবিভাগ ও ডানপাশের সুরশলাকার 'U' আকৃতির অঞ্চল দ্বারা কুণ্ডলিত বা সর্পিল ছায়াপথদের শ্রেণিবিভাগ বোঝানো হয়েছে। ১৯২৬ সালে হাবল এই ছক প্রকাশ করলেও এখনও ছায়াপথদের শ্রেণিকরণে তা অনুসরন করা হয়।

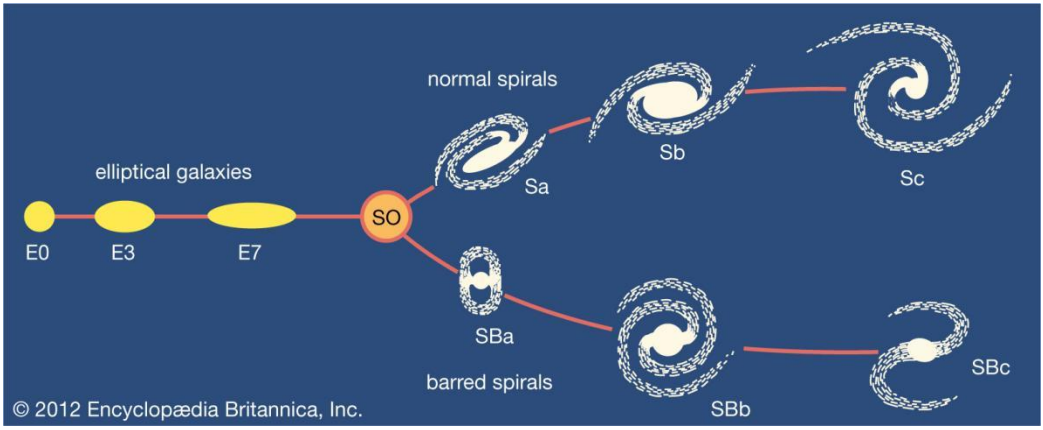

এই ধরনের ছায়াপথগুলিকে আবার আরও উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যখন একই সময়ে অন্যান্য ধরনের ছায়াপথগুলি তাদের আকার এবং অন্যান্য অনন্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান।

তবে এডউইন হাবল এর আগে 1926 সালে টিউনিং ফর্ক বা সুরশলাকার আকারের ছকে হাবল তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে উপবৃত্তাকার ছায়াপথগুলোর উৎকেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে উপবৃত্তাকার আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ০ থেকে ৭ এর স্কেলে শ্রেণিকরণ করেন। শূন্য স্কেলে থাকা ছায়াপথগুলি একদম বৃত্তাকার আকৃতির। পক্ষান্তরে ৭ স্কেলে থাকা ছায়াপথগুলি অত্যধিক উপবৃত্তাকার আকৃতির। অর্থাৎ ৭ স্কেলে থাকা ছায়াপথগুলি হলো সবচাইতে উপবৃত্তাকার

আকৃতির। একটি উপবৃত্তাকার ছায়াপথের স্কেলের অবস্থান যত বেশি সেই গ্যালাক্সি তত বেশি উপবৃত্তাকার। E-০ দ্বারা বোঝানো হয় ছায়াপথটি উপবৃত্তাকার শ্রেণির কিন্তু এদের উপবৃত্তাকার আকৃতি চোখে পড়ার মতো নয় বা সহজ অর্থে বৃত্তাকার। E-৭ দ্বারা বোঝানো হয় ছায়াপথটি বেশি উপবৃত্তাকার। তেমনি E-৪ আকৃতির ছায়াপথ হলো একদম সঠিক ডিম্বাকৃতির।

ডান পাশের ছায়াপথরা হলো সর্পিল ছায়াপথ বা Spiral Galaxy। এর বাহুগুলির সন্নিবেশের উপর ভিত্তি করে সর্পিল ছায়াপথদের ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। a, b ও c । a দ্বারা বোঝানো হয় ছায়াপথটির কুণ্ডলিত বাহুগুলি ঘনভাবে সন্নিবেশে অবস্থান করছে। পক্ষান্তরে c দ্বারা বোঝানো হয় ছায়াপথটির কুণ্ডলিত বাহুগুলি একে অপরের থেকে বেশ দূরে অর্থাৎ ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। আর b দ্বারা বোঝানো হয় কুণ্ডলিত বাহুগুলি খুব ঘনভাবেও না আবার খুব দূরে দূরেও অবস্থান করছে না। সর্পিল ছায়াপথদের কুণ্ডলীর এই সন্নিবেশের উপর ভিত্তি করে তাই Sa, Sb, Sc দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

সর্পিল ছায়াপথদের শ্রেণিবিভাগে দুইটি উপশ্রেণি আছে। একটি হলো সাধারণ সর্পিল ছায়াপথ আরেকটি বারযুক্ত সর্পিল ছায়াপথ। বারযুক্ত নামকরণের কারণ, এদের অদ্ভুত এক বার থাকে। চিত্রের টিউনিং ফর্কের ডান পাশের নিচের অংশ দ্বারা বারযুক্ত সর্পিল ছায়াপথ বা Barred Spiral Salaxy 65 CIRCTI হয়েছে। বারযুক্ত সর্পিল ছায়াপথের কেন্দ্র বরাবর একটি লাইন (Line/Bar) থাকে যেখানে নক্ষত্র ও গ্যাস ঘনভাবে অবস্থান করে। আর এদের এমন অবস্থান ও ঘনভাবে অবস্থিত নক্ষত্রদের আলোর জন্য ছায়াপথের মাঝের অংশটি লম্বা বারের মতো মনে হয়। সর্পিল ছায়াপথের দুই-তৃতীয়াংশ ছায়াপথই বারযুক্ত সর্পিল ছায়াপথ। সুন্দর এই ছায়াপথগুলো সাধারণ সর্পিল ছায়াপথদের পূর্বে উল্লেখিত Sa, Sb, Sc দ্বারা প্রকাশ করা হলেও বারযুক্ত সর্পিল ছায়াপথ বা Barred Spiral Galaxy-দের নামকরণে একটি অতিরিক্ত বড়ো হাতের 'B যোগ করা হয় এটি বুঝাতে যে এদের বার আছে। এদের প্রকাশ করা হয় SBa, SBb, SBc দ্বারা। SBa দ্বারা বোঝানো হয় ছায়াপথটির বার আছে ও ছায়াপথটির কুণ্ডলিত বাহুগুলি ঘনভাবে সন্নিবেশে অবস্থান করছে। SBc দ্বারা বোঝানো হয় ছায়াপথটির বার আছে ও ছায়াপথটির কুণ্ডলিত বাহুগুলি দূরে দূরে অবস্থান করছে। SBb দ্বারা নির্দেশ করা হয় চায়াপথটির বার আছে কিন্তু কুণ্ডলিত বাহুগুলো না ঘনভাবে না দূরে দূরে আছে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বার আছে এবং একইসাথে এটির কুণ্ডলিত বাহুগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই একে SBc শ্রেণীতে রাখা হয়েছে।

টিউনিং ফর্ক ও হাতলের মাঝে So নামে আরেক শ্রেণীর ছায়াপথ আছে। এদের লেন্টিকুলার

ছায়াপথ (Lenticular Galaxy) বলা হয়। এই শ্রেণির ছায়াপথরা না উপবৃত্তাকার আর না সর্পিলাকার। এদের আকৃতি দেখে এদের পৃথক্করণ করা যায় না। তাই এদের S-o টাইপে রাখা হয়েছে। আর এবড়োথেবড়ো, হরেকরকম আকৃতির, দানব উপবৃত্তাকার ছায়াপথ, বা অন্য কিছু ছায়াপথ এই টিউনিং ফর্ক ছকে রাখা হয়নি। The Hubble Tuning Fork-এর বাইরের শ্রেণিভুক্ত এই ছায়াপথরাই অনিয়মিত আকৃতির ছায়াপথ। অনেকে সর্পিল ছায়াপথদের বিবর্তনকে Sa/SBa থেকে Sc/SBc দ্বারা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ Sa/SBa থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে Sc/SBc ছায়াপথে পরিণত হয়। আরেক অর্থে Sa/SBa হলো প্রথম প্রজন্মের ছায়াপথ।

গ্যালাক্সির প্রকারভেদ চিনে থাকলে পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নাও এখানে - https://cutt.ly/nEbudSp

আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি একটি সর্পিলাকার গ্যালাক্সি

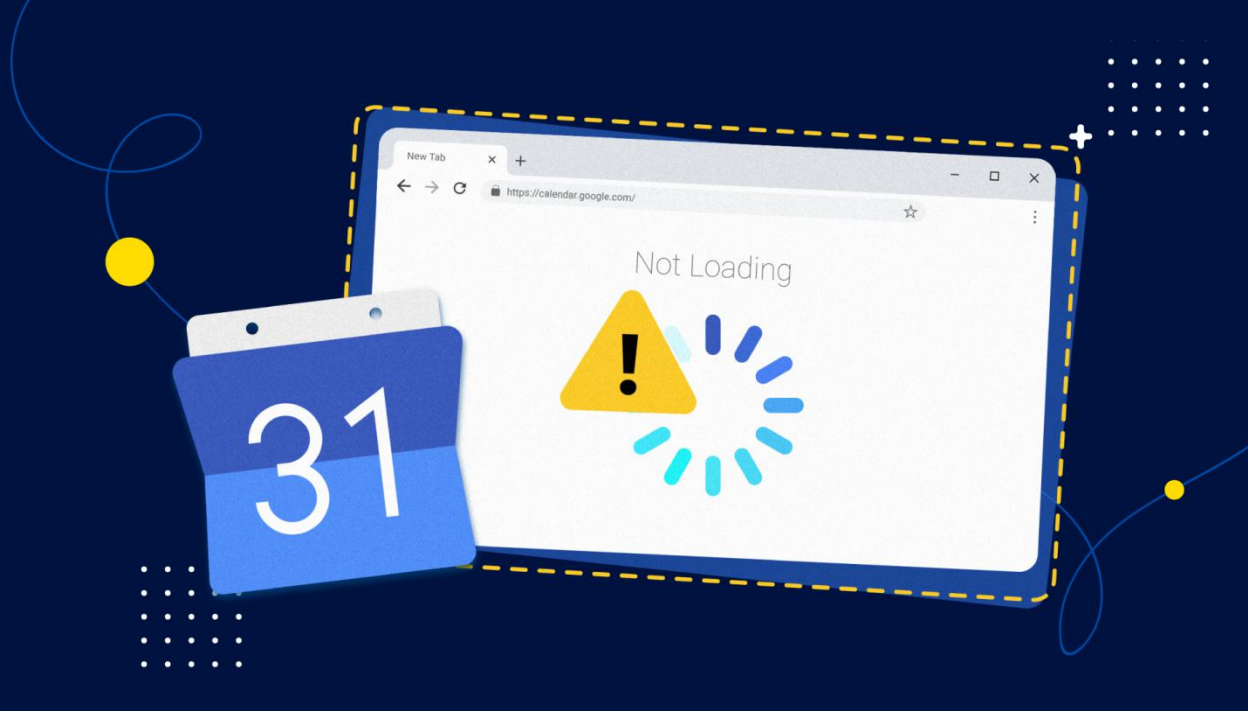

তারিখের সমস্যা

মোঃ আক্তারুজ্জামান

জুলিয়ান ক্যালেন্ডার

জুলিয়ান ক্যালেন্ডার, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ইতিহাস অনেক বড়ো আর জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন একটু জটিল পর্যায় অতিক্রম করেই হয়েছিল। আমরা যেহেতু বছর, মাসের হিসাব-নিকাশ বিষয়ে জানব তাই ইতিহাস বিষয়ে আমাদের যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হবে। না হলে সব একসাথে জগাখিচুড়ি হয়ে যাবে। যাই হোক, জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রবর্তক ছিলেন রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার। আগে রোমানরা চাঁদের উপর ভিত্তি করে বছর গণনা করত। তবে তাদের মাসগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল একটু অন্যরকম। বছরের ৭টি মাস ২৯ দিনে, ৪টি মাস ৩১ দিনে এবং একটি মাস ২৮ দিনে করা হতো। মোট ৩৫৫ দিন। এরপর রোমানরা পরবর্তী বছরের সঙ্গে অতিরিক্ত ২২/২৩ দিন যুক্ত করে অতিরিক্ত একটি মাস হিসাব করতো। এই মাসের নাম ছিল মার্সেডোনিয়াস। বোঝাই যাচ্ছে সমস্যাটা গুরুতর ছিল। কোন বছরে ১২টা মাস আবার কোন বছরে ১৩টা মাস। অবশেষে ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সময়কালে জুলিয়াস সিজার আলেকজান্দ্রিয়ান জ্যোতির্বিদ

সোসিজিনির পরামর্শ নিয়ে বছর গণনার জন্য সৌরঋতুকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সৌরবর্ষের ভিত্তিতে ক্যালেন্ডারের সূচনা করেন।

এক বছরকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা মেনে নিয়ে এই ক্যালেন্ডারের সুচনা হয়। জুলিয়াস সিজার জানুয়ারির প্রথম দিনকে বছরের শুরু হিসেবে ব্যবহারের আদেশ দেন। তার নামানুসারেই পূর্বে রোমানদের ব্যবহৃত কুইন্টালিস মাসের নামকরণ করা হয় জুলাই হিসেবে। এরপর আসেন জুলিয়াস সিজারের উত্তরাধিকারী অগাস্টাস সিজার। পরবর্তীতে তার নামানুসারে সেক্সটিলিস মাসের নাম রাখা হয় অগাস্ট। আবার জুলিয়াস ও অগাস্টাস দুজনেই তাদের নামানুসারে মাসগুলোকে ৩১ দিন করার আদেশ দিলেন। ফলে ফেব্রুয়ারির কপালে জুটলো দুর্ভাগ্য। ঐ মাসটি হয়ে গেল ২৮ দিনে। আর জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে যেহেতু ১ বছরকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা বা ৩৬৫.২৫ দিন বিবেচনা করা হলো তাই ৪ বছরে ১ দিন অতিরিক্ত থেকে যেতো। এই অতিরিক্ত দিনকেই লিপ ইয়ার হিসেবে ধরা হতে থাকল। অর্থাৎ জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, যেসব বছরকে ৪ দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যাবে সেগুলোই লিপ ইয়ার বলে গণ্য হতে থাকল। এভাবেই মোটামুটি হিসাব চলছিল। কিন্তু এই হিসাবের ত্রুটি ছিল অনেক। সেই ত্রুটি সমাধান হলো আরো বহু পরে। যাই হোক, রোমান ক্যালেন্ডার পূর্বে কিন্তু অনেক ত্রুটিপূর্ণ ছিল। রোমান সম্রাট রোমুলাস সেই খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ সালের দিকে যে ক্যালেন্ডারের সূচনা করেছিলেন তা ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয়ে জুলিয়াস ও অগাস্টাস-এর হাত ধরে মোটামুটি একটা পূর্ণতা পেল। এই ক্যালেন্ডার রাজত্ব করল ১৫৮২ সাল পর্যন্ত।

September 1752 (United States)

September						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার

এরপর ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের একটি সংস্করণ করেন। আর সেই অনুযায়ী ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। এটাই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার যেটা আমরা এখন ব্যবহার করি। সংস্করণটি ছিল এমন : জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে বছর গণনা হতো ৩৬৫.২৫ দিনে। কিন্তু এই হিসাবটি নিখুঁত না। আমাদের পৃথিবীর গতিপথ বড়োই জটিল। একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে এর সময় লাগে গড়ে প্রায় ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের কাছাকাছি সময় (এই সময় কিন্তু প্রতিবছর একই রকম হয় না) যাই হোক, বছরের এই হিসাবটি নিয়ে গ্রেগরি তার ক্যালেন্ডারের সূচনা করেছিলেন।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডার ও গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের বছরের দৈর্ঘ্যের এই পরিবর্তন কিন্তু একটি অন্যরকম সমস্যার সৃষ্টি করল। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের এক বছরকে যদি দিনে রূপান্তর করা হয় তাহলে পাওয়া যায় ৩৬৫.২৪২২ দিন প্রায়। কিন্তু জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩৬৫.২৫ দিন। তাহলে এই দুই ক্যালেন্ডারে দিনের পার্থক্য হলো ৩৬৫.২৫ - ৩৬৫.২৪২২ = ০.০০৭৮ দিন। অর্থাৎ ১ বছরে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে ০.০০৭৮ দিন স্লো হয়ে যাচ্ছে। এমনভাবে চলতে থাকলে ১/০.০০৭৮=প্রায় ১২৮ বছর পর জুলিয়ান ক্যালেন্ডার পুরো ১ দিন এগিয়ে যাবে। এখন আমরা দেখে আসলাম যে ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয়েছিল আর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ১৫৮২ সালে। তাহলে মোট অতিক্রান্ত বছর হলো ১৫৮২+১+৪৬=১৬২৯ বছর। যেহেতু ১২৮ বছরে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার পুরো ১ দিন এগিয়ে যায় তাই ১৬২৯ বছরে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার এগিয়ে যাবে ১৬২৯/১২৮=প্রায় ১২.৭৩ দিন। অর্থাৎ জুলিয়ান ক্যালেন্ডার হতে গ্রেগরি যখন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনা করলেন তখন পুরাতন ক্যালেন্ডার থেকে (জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে) কিন্তু ১২ দিন বাদ দিতে হতো। (একদম নিখুঁত হিসাব করলে ১০ দিনের মতো আসে)। একারণে ১৫৮২ সালের ১৫ অক্টোবর আসলে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে ১৫৮২ সালের ৫ অক্টোবর! হিসাবের সুবিধার্থে গ্রেগরিয়ান ও জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের রূপান্তরের একটু ছক অনুসরণ করা হয় :

১৫ অক্টোবর ১৫৮২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭০০ সাল অব্ধি জুলিয়ান ও গ্রেগরিয়ানে ১০ দিনের পার্থক্য।

১ মার্চ ১৭০০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮০০ পর্যন্ত ১১ দিনের পার্থক্য।

১ মার্চ ১৮০০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ পর্যন্ত ১২ দিনের পার্থক্য।

১ মার্চ ১৯০০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২১০০ পর্যন্ত ১৩ দিনের পার্থক্য।

1582	OCTOBER					1582
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

যেমন : আজ যদি ২০২১ সালের ১৪ জানুয়ারি হয় তাহলে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে সেটা হবে ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হওয়ার পরেই কিন্তু সব দেশ সেটা গ্রহণ করেনি। চালু হওয়ার পরপরই গ্রহণ করেছিল স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্সসহ কয়েকটি দেশ। এভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করা শুরু করল। ১৫৮২ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার কিংবা ১৭৫২ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করা ব্রিটেন-এর ক্যালেন্ডার দেখলে বোঝা যাবে যে জুলিয়ান থেকে গ্রেগরিয়ানে আসতে তাদের ক্যালেন্ডারে কতটা পরিবর্তন করতে হয়েছিল।

রেডিয়ো টেলিস্কোপের টুকিটাকি

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

গ্যালিলিওর সময়কালে টেলিস্কোপ খুব হাইপ তুলেছিল। বিজ্ঞানী নিউটনের সময়ও হাইপে ছিল এই টেলিস্কোপ। এমনকি নিউটন নিজেই টেলিস্কোপের গঠনের বিপুল উৎকর্ষ সাধন করেন। তবে এই টেলিস্কোপ ছিল আলোর প্রতিসরণ ধর্মকে ব্যবহার করে তৈরি করা টেলিস্কোপ। ফলে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। আর তা হলো, আমরা যত দূরের জিনিস দেখতে ইচ্ছুক হই, টেলিস্কোপের নলের দৈর্ঘ্য তত বড়ো করতে হয়। আমরা যদি কেবল আমাদের গ্যালাক্সির বস্তুগুলোই পর্যবেক্ষণ করতে যাই, তাহলেই প্রচুর অর্থ খরচ করতে হবে। তবে ১৯০০ সালের শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, মহাজগতের সকল বস্তু (নক্ষত্র, গ্যালাক্সির কেন্দ্র, নিউট্রন তারকা, ব্ল্যাকহোল) ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ বিকিরণ করে। তারা চিন্তা করলেন, এই সিগন্যাল বিশ্লেষণ করেই তো ঐ বস্তু সম্পর্কে জানা যায়, বস্তুটিকে সরাসরি না দেখেই। সেখান থেকেই আবিষ্কার হয় রেডিয়ো টেলিস্কোপ।

মনে রাখতে হবে, এই রেডিয়ো সিগন্যাল, মানুষের তৈরি রেডিয়ো সিগন্যালের মত না।

আমরা যদি একটি অ্যানালগ রেডিয়ো চালু করি তাহলে সেখানে যে হিস্স্ শব্দ শুনতে পাই, তার অধিকাংশ ঐ যন্ত্রের কারণে তৈরি হয়, কিছু অংশ বজ্রপাতের কারণে আর খুবই অল্প অংশ মহাজগৎ থেকে আসা রেডিয়ো সিগন্যালের কারণে।

একটি অ্যানালগ রেডিয়ো

একটি রেডিয়ো টেলিস্কোপের প্রধান তিনটি পার্ট থাকে। অ্যান্টেনা, রিসিভার ও রেকর্ডার।

অ্যান্টেনা

একটি রেডিয়ো টেলিস্কোপের অ্যান্টেনা বা ডিশ অ্যান্টেনার কাজ হচ্ছে মহাবিশ্ব থেকে আশা সিগন্যাল প্রতিফলিত করে একটি ফোকাসে দেওয়া। সাধারণত একটি ডিশ অ্যান্টেনার আকার প্যারাবোলিক হয়। ফলে মহাবিশ্ব থেকে সিগন্যালগুলো সমান্তরালে আসলেই তা একটি নির্দিষ্ট ফোকাসে এসে জমা হয়।

রিসিভার

সিগন্যালগুলো যে ফোকাসে এসে জমা হয় সেখানে একটি রিসিভার লাগানো থাকে। সেই রিসিভার মহাবিশ্ব থেকে আসা সিগন্যালগুলোকে কালেক্ট করে। ব্যাস, আমাদের কাজ কিন্তু প্রায় শেষ। তবে একটি ঝামেলা হয়েছে। রিসিভারে জমা হওয়া সিগন্যালগুলো বেশ দূর্বল। এতো দূর্বল সিগন্যাল দেখে কোনো কিছু যাচাই করা বেশ মুশকিল। তাই এখানে একটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যা এই দূর্বল সিগন্যালকে সবল সিগন্যালে পরিণত করে দেয়। ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় এ যন্ত্রকে বলে অ্যামপ্লিফায়ার বা বিবর্ধক।

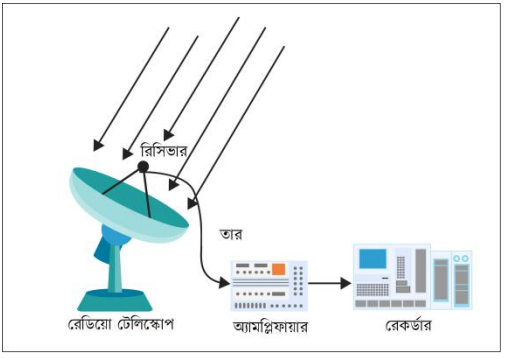

রেকর্ডার

রিসিভারে আসা সিগন্যালগুলো যাতে হারিয়ে না যায়, তাই সেগুলোকে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে রেকর্ড করে রাখা হয়।

এই সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে খুব সহজেই আমরা একটি নক্ষত্রের চারিদিকে কোনো গ্রহ ঘুরছে কি না বলে দিতে পারি। পৃথিবী থেকে ১০০ আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্র কী দ্বারা তৈরি তা-ও বলে দিতে পারি। এটাই রেডিয়ো জ্যোতির্বিজ্ঞানের মজা। নক্ষত্রটি সম্পর্কে জানার জন্য নক্ষত্রটিকে সরাসরি দেখাও লাগল না।

তবে পৃথিবীর একটি আয়োনোস্ফিয়ার আছে। এর মধ্য দিয়ে দুর্বল ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক সিগন্যাল আসার সময় বিকৃত হয়ে যায়। তাই রেডিয়ো টেলিস্কোপগুলো সাধারণত পাহাড়ের উপর রাখা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরেও অনেক রেডিয়ো টেলিস্কোপ জায়গা করে নিয়েছে।

রেডিয়ো টেলিস্কোপের মধ্যে অন্যতম একটি টেলিস্কোপ হতে চলেছে স্কয়ার কিলোমিটার অ্যারে। টেলিস্কোপের ডিশ যত বড়ো হবে, তত বেশি সিগন্যাল ডিটেক্ট করতে পারবে। তাই 2003 সালের দিকে তারা আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার জনপদ থেকে দূরের অঞ্চলে এরকম একটি রেডিয়ো টেলিস্কোপ তৈরি করা শুরু করে যেখানে অনেকগুলো রেডিয়ো টেলিস্কোপ একত্রে মিলিয়ে কাজ করবে। এর নাম রাখা হয় SKA (Square Kilometre Array)। প্রতি কিলোমিটার বর্গক্ষেত্রে একটি টেলিস্কোপ আছে বলে এর এমন নাম। 2031 সাল নাগাদ এটি প্রথম সিগন্যাল গ্রহণ করতে সক্ষম হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

আরেসিবো রেডিয়ো টেলিস্কোপ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রেডিয়ো টেলিস্কোপ হিসেবে পরিচিত ছিল। পুয়ের্তো রিকোতে অবস্থিত ৩০৫ মিটার ব্যাসের টেলিস্কোপটিতে গতবছর একটি ফাটল দেখা দেয় যার ফলে এর কিছু অংশ ভেঙ্গে পরে। এরপর থেকে অচল অবস্থায় রাখা হয় টেলিস্কোপটিকে।

ভেঙ্গে যাওয়া আরেসিবো রেডিয়ো টেলিস্কোপ

একে সংস্কার করতে গেলে বাকি অংশও ভেঙ্গে যাবে। তাই একে ভেঙ্গে ফেলা হয়। ১৯৬৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি গুরুত্বপূর্ণ সকল মিশনে কাজ করে আসছিল।

বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রেডিয়ো টেলিস্কোপ হিসেবে স্থান দখল করে আছে চীনের FAST টেলিস্কোপ। কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই ২০১৭ সালে এই টেলিস্কোপের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা PSR J1859-01 ও PSR J1931-02 নামে দুইটি পালসার আবিষ্কার করে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত এটি ৪৪টি পালসার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেডিয়ো টেলিস্কোপ FAST

বর্ষসেরা অ্যাস্ট্রোনমি ফটোগ্রাফি

রওনক শাহরিয়ার

ইংল্যান্ডের National Maritime Museum আয়োজিত ফটোগ্রাফি কনটেস্টের Shuchang Dong বর্ষসেরা অ্যাস্ট্রোনমি ফটোগ্রাফার হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি তিব্বতে ২১ জুন সূর্যগ্রহণের ছবিটা তুলেন, যে-সময় আকাশ সম্পূর্ণ মেঘে ঢেকে ছিল! সর্বোচ্চ গ্রহণের শেষ মূহুর্তের ছবিগুলো চমৎকার হয়, কিন্তু এই ছবির স্পষ্টতা এককথায় অসাধারণ! ছবিতে চাঁদ সূর্যের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় রিং-এর মতো দেখা যায়, যার ডানদিকের নিচে চাঁদের পাহাড়সমূহের দ্বারা কিছু আলোর আটকে যাওয়ার মতো দৃশ্য দেখা দেয়।

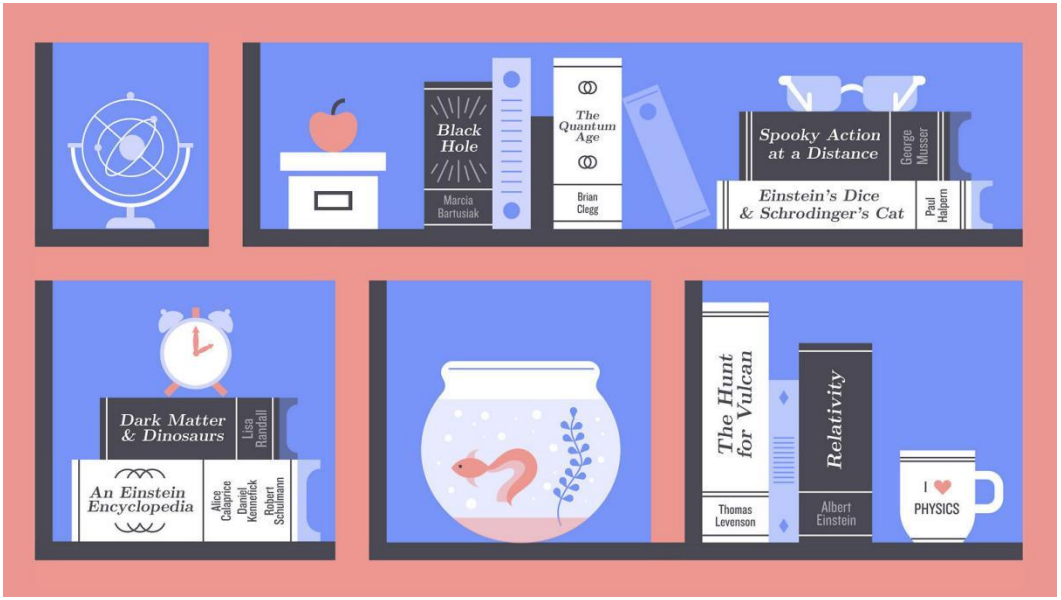

কসমোলজির বইগুলো

নাজমুল সরদার আশিক

খুব সহজভাবে বললে, বিজ্ঞানের যে শাখায় মহাবিশ্বের উৎপত্তি, বিবর্তন, উপাদান, গঠন, অন্তিম পরিণতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকেই Cosmology (সৃষ্টিতত্ত্ব) বলে। গ্রিক সভ্যতায়ও কসমোলজি চর্চার ইতিহাস পাওয়া যায়। তবে তা আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনায় শিশুসুলভ। মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞানীরা কসমোলজি চর্চা করতেন। গ্যালিলিও-নিউটনের সময় থেকে কসমোলজির পালে নতুনভাবে হাওয়া লাগে। মাঝখানে আরো কিছু ইতিহাস আছে। সে আলাপ আরেকদিন করা যাবে। তবে আধুনিক কসমোলজির সূত্রপাত ঘটে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে। এরপর থেকে ব্যাপক বিপ্লব ঘটে এ শাখায় আর পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞানের একটা অর্গানাইজড শাখায় এটি উত্তীর্ণ হয়। কসমোলজিসংক্রান্ত পড়াশোনা একটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে করতে নিচের বইগুলো যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে করি।

The Philosophy of Cosmology

নিউটনের সময়েও ভৌতবিজ্ঞান 'Natural Philosophy' নামে পরিচিত ছিল। বিজ্ঞানের সূত্রপাত বলা যায় অনেকটা দর্শন থেকেই। আপনি যে-কোনো একটা বিষয় খুব ভালোভাবে পড়বেন কিন্তু এর দর্শন পড়বেন না, জানবেন না তা তো হয় না! বিজ্ঞানের দর্শন, ধর্মের দর্শন, ইতিহাসের দর্শন এমন কতশত সিস্টেমেটিক ওয়ে আছে পড়াশোনার। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের প্রফেসর জন ডেভিড ব্যারোর মতো বিশ্বখ্যাত কসমোলজিস্ট-সহ আরো তিনজন স্কলার বইটি সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে দুইজন দর্শনের আর দুইজন কসমোলজির স্কলার। এই দুই শাস্ত্রের পণ্ডিত ছাড়াও গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান, ফিলোসোফি অব সায়েন্স ফিল্ডের সারাবিশ্ব থেকে ৩০ জন নামকরা স্কলার এতে কন্ট্রিবিউট করেছেন। এটি পুরোদস্তুর একটি অ্যাকাডেমিক বই। প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ম্যাথেমেটিক্যাল (জটিল থেকে জটিলতর) এক্সপ্রেশন আছে।

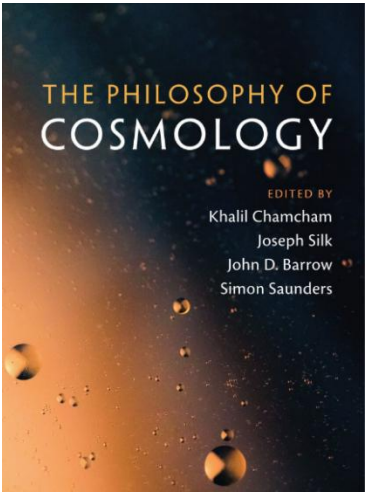

Higer Speculations: Grand Theories and Failed Revolutions in Physics and Cosmology

বইটির লেখক Helge Kragh, Columbia University-এর হিস্ট্রি অব সায়েন্সের (ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমি) প্রফেসর ছিলেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব কোপেনহেগেনের "Niels Bohr Institute"-এর ইমিরেটস প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন। বইটি মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। কসমোলজি আর ফিজিক্সের বিবর্তনের প্রক্রিয়া

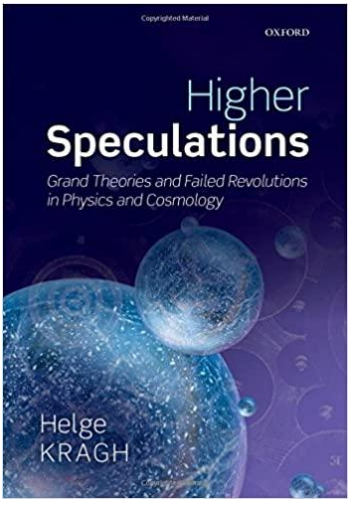

বর্ণনার মাধ্যমে এর বিভিন্ন কন্ট্রোভার্সি, এনথ্রোপিক প্রিন্সিপাল, মাল্টিভার্স সিনারিও, স্ট্রিং থিওরি, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি, অ্যাস্ট্রোবায়োলজি আর ফিজিক্যাল অ্যাস্কেটোলজি নিয়ে চমকপ্রদ সব আলোচনা রয়েছে।

The Routledge Companion to The New Cosmology

বিখ্যাত কসমোলজিস্ট Peter Coles বইটি সম্পাদনা করেছেন। এটি মূলত কসমোলজির একটি শব্দকোষ। এ বিষয়ে আগ্রহীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য একটি বই। এটির প্রথম অংশে ৬ জন কসমোলজিস্ট ৬টি প্রবন্ধে আধুনিক কসমোলজির ফাউন্ডেশন, কসমিক স্ট্রাকচার, ভেরি আরলি ইউনিভার্স, কসমসের নিত্যনতুন গবেষণাক্ষেত্র,

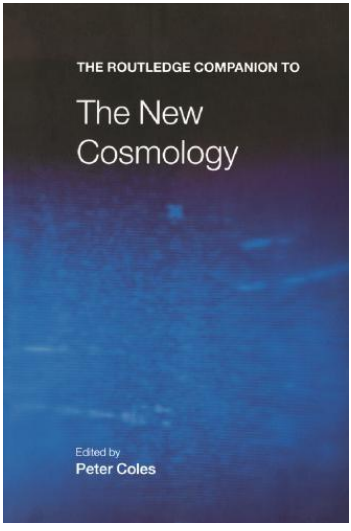

কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড তরঙ্গ, গ্র্যাভিটি লেন্সের সাহায্যে মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণসংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। ২য় অংশ পুরোটাই শব্দকোষ। অনেক অনেক কাজের এই অংশটি।

The Oxford Handbook of The History of Modern Cosmology

এই সিরিজের এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। Helge Kragh আর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাচারাল ফিলোসোফির ইমিরেটস প্রফেসর Malcolm Longair বইটি সম্পাদনা করেছেন। আধুনিক কসমোলজির শুরু থেকে আজতক নিত্যনতুন আবিষ্কার, এর বিবর্তন আর সর্বশেষ গবেষণাবিষয়ক অসাধারণ সব আর্টিকেলে ভরপুর

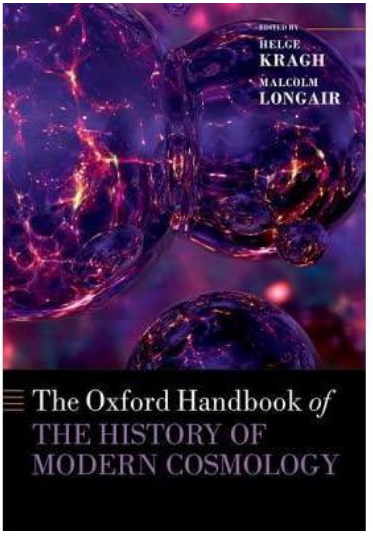

বইটি। বিশ্বের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রোনমি, ফিজিক্স, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, হিস্ট্রি এন্ড ফিলোসোফি অব সায়েন্স বিভাগের ৮ জন বিখ্যাত স্কলার এতে কন্ট্রিবিউট করেছেন।

Cosmology for the Curious

বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা Springer থেকে এটি প্রকাশিত। কেউ যদি আমাকে বলে কসমোলজিসংক্রান্ত পড়াশোনা কোন বই দিয়ে শুরু করব? আমি একমুহূর্ত চিন্তা না করে এই বইটি রিকোমেন্ড করব। স্টিফেন হকিং *'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইমে'* বলেছিলেন পপুলার সায়েন্সের বইতে গাণিতিক টার্ম ব্যবহার করলে এক দশমাংশ হারে পাঠক কমে যায়! তবে এই বইটির লেখকদ্বয় Delia Perlov আর Alex Vilenkin যেখানে প্রয়োজন সেখানে গাণিতিক ইকুয়েশন ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি।

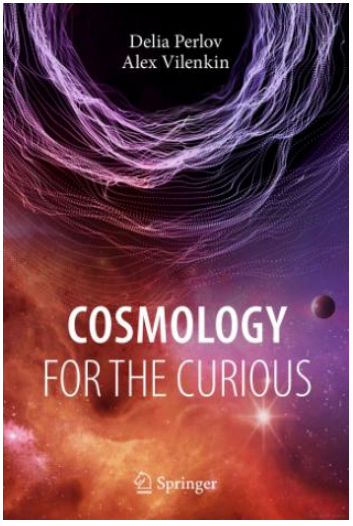

Ripples in Spacetime

বইটিতে নেদারল্যান্ডসের জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লেখক ও জ্যোতির্বিদ Govert Schilling আইনস্টাইনের সময়-কাল, জেনারেল রিলেটিভিটির অভূতপূর্ব সব ভবিষ্যদ্বাণী, গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ আবিস্কারের প্রেক্ষাপট থেকে সফলতা লাভের কাহিনি, পৃথিবীর অন্যতম সেরা গবেষণাগার ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চের (সার্ন) বিভিন্ন গবেষণাপ্রকল্প আর অ্যাস্ট্রোনমির ভবিষ্যৎ নিয়ে চমৎকার সব আলোচনা করেছেন। বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে এর ভূমিকা লিখেছেন ইংল্যান্ডের রাজকীয় জ্যোতির্বিদ মার্টিন রীস।

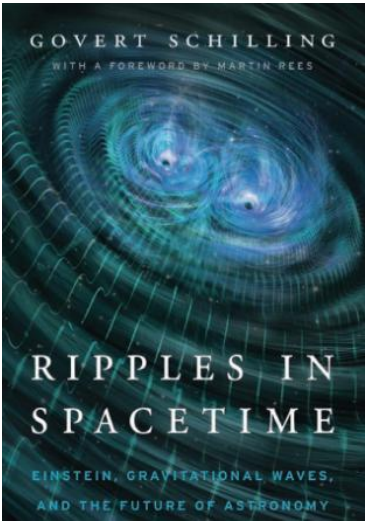

The Trouble with Physics: The rise of String theory, the fall of a science and what comes next

এ বছরে যত বই পড়েছি তার মধ্যে এই বইটি সবার ওপরের তালিকায় থাকবে। এত ইনসাইটফুল, গভীর, আকর্ষণীয় আর ক্রিটিক্যাল চিন্তাভাবনা আছে বইটিতে যা বলে বোঝানো যাবে না। যারা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চান, তাদের জন্য মাস্টরিড একটা বই। লেখক বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী Lee Smolin কোয়ান্টাম গ্রাভিটিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বইটিতে লেখক ফিজিক্সের একদম ফান্ডামেন্টাল বিষয়ে চিন্তা-জাগানিয়া কিছু প্রশ্ন তুলে বিশ্লেষণধর্মী উত্তর দিয়ে গেছেন। ২০২০ সালের ফিজিক্সে নোবেল বিজয়ী গাণিতিক পদার্থবিদ, বর্তমান দুনিয়ায় আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির সবচেয়ে বড় পণ্ডিতদের একজন ও ২০২০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারজয়ী স্যার রজার পেনরোজ বইটির কন্টেন্টের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেছেন,

> Unusually broad and deep… his critical judgements are exceptionally penetrating

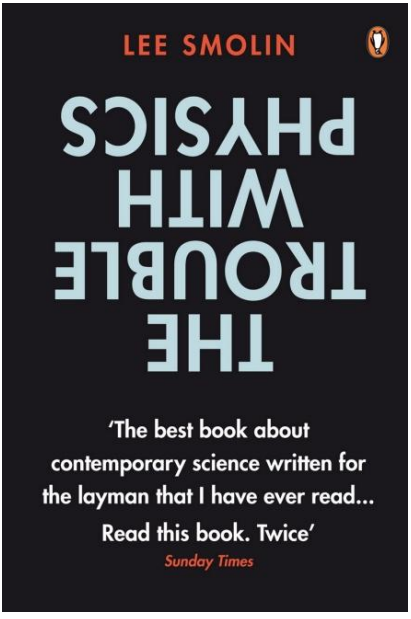

দিনের বেলায় চাঁদ!

রওনক শাহরিয়ার

সময়টা সকাল দশটা। ওপরে সূর্যের মৃদু আলো, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আকাশে চাঁদ দেখা যায়, এমনকি বিকাল বা ভোরেও! এমনটা বহুবার দেখার সুযোগ হয়েছে খোলা আকাশের পানে চেয়ে।

তবে প্রশ্ন আসেই, চাঁদ যদি রাতে ওঠে, দিনে দেখতে পাওয়ার কারণ কী?

উত্তরটা বেশ সহজ ও চমৎকার।

রাতে বেলায় আকাশ ভরা তারা, ইয়া বড়ো চাঁদ দেখা যায়। এগুলো দিনে দেখা না গেলেও নক্ষত্র, গ্রহ কিংবা চাঁদ সবসময়ই আকাশে থাকে। আমরা

দেখতে পাই না, কারণ সূর্যের আলোর উজ্জলতা চাঁদের চেয়ে ৪০০০০ গুণ বেশি হয়।

মূলত চাঁদের নিজস্ব কক্ষপথ আছে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৯.৫ দিনে একবার ঘুরে আসে। বা প্রতিদিন নিজের অবস্থান থেকে ১৩° সরে যায়। যার ফলে ৫০ মিনিটের একটা ডিফারেন্স দেখা দেয় আগের দিনের চেয়ে। শুধু পূর্ণিমার সময় চাঁদ পূর্ব দিক থেকে ওঠে, যখন সূর্য অস্তমিত হয় এবং সারারাত জুড়ে আকাশে থাকে। এর মানে চাঁদ শুধু আকাশে মাসে মাত্র একরাত পুরোপুরি থাকে। বাকিসময় চাঁদ ওঠা ও অস্তমিত যাওয়া তার সূচি অনুযায়ী হয়, যার সাথে সূর্য ওঠা বা অস্তমিত যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। যার জন্য মাস জুড়ে চাঁদ একটা নির্দিষ্ট উপায়ে বিভিন্ন ফেজে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

বা আমাদের দৃষ্টিসীমার ১৮০° এর মধ্যে মাসে একদিন চাঁদ থাকবে, বাকি সময়গুলোতে আকাশের ০ থেকে ১৮০° এর কোনো স্থানে অবস্থান করবে।

কোন সময়ে চাঁদ দিনের সময় দেখতে দেখা যায়:

১. পূণিমার সপ্তাহখানেক আগে,

২. পূর্ণিমার আগের বিকালগুলোতে,

৩. পূর্ণিমার পরের সকালগুলোতে,

৪. আর বেশিরভাগ সময় থাকলেও, আকাশে নীল আলোর বিচ্ছুরণের এই প্রতিফলিত আলো ফিকে হয়ে যায়।

দুটো কারণে দিনে চাঁদ দৃশ্যমান হয়।

প্রথমত, চাঁদের আলোর উজ্জলতা এতটা বেশি হবে তা আলোর নীল আলোর বিচ্ছুরণকে হার মানাবে।

যদি শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও কিছু নক্ষত্রের একেবারে সঠিক দিকে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা হয়, তবে এই কারণে আমরা দেখতে পাব।

দ্বিতীয়ত, চাঁদের অবস্থান এমন স্থানে হতে হবে যাতে সেটা দেখা সম্ভব হয়।

পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে মোট ২৪ ঘণ্টার ১২ ঘন্টায় চাঁদ আকাশের কোনো না কোনো স্থানে থাকে। যেহেতু এখানে দিন রাত বড়ো কিছু না, তাই দিনের সময় গড়ে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত চাঁদ আকাশে থাকতে পারে। আর ওপরে বর্ণিত সময়গুলোতে সূর্যের থেকে ৯০°-এর বেশি থাকায় বেশি দৃশ্যমান হয় আকাশে। যদিও দিগন্তের কম দূরত্বেও দেখা সম্ভব, তবে স্পষ্ট হবে না তেমন।

সোর্স :

https://earthsky.org/space/when-can-you-see-a-daytime-moon/
https://www.space.com/amp/7267-moon-daylight.html
https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2019/10/15/this-is-why-you-can-now-see-the-moon-during-the-day/amp/

মহাকর্ষ

আবু তালহা সিয়াম খান

মহাকর্ষ মহাকর্ষ
অধরা তুমি এক রহস্য,
শত বিজ্ঞানীর মাথা গুলিয়ে
টিকে আছো এখনো বুক ফুলিয়ে।

নিউটনের হাত ধরে
গুটিগুটি পায়ে আসা সেই অভিকর্ষ,
আইনস্টাইনের সঙ্গ পেয়ে
হলে গিয়ে স্থান-কালর বক্রতার মহাকর্ষ।

প্রাণ সৃষ্টির কেন্দ্র তুমি
পঞ্চবলের মহারথী মহাকর্ষ,
মনের চেয়ে গহিন তুমি
বিস্তৃত মহাকর্ষ।

চাঁদের পানি কি পানযোগ্য?

শাহরীন উৎসব

সম্প্রতি নাসার বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপৃষ্ঠের উপরিভাগে বরফের পানি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যেটি নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার। Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) নামের একটি জেটলাইনারের সাহায্যে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা হচ্ছে, চাঁদে প্রায় 40,000 বর্গকিলোমিটার কিংবা 24,000 মাইল এলাকাজুড়ে পানি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সবথেকে বড়ো প্রশ্নটি হলো, এ পানি পানযোগ্য কি না?

উত্তর হলো, হ্যাঁ । আমরা এ পানি পান করতে পারব!

> আমরা চাঁদের পানি পান করতে পারব। কিন্তু পানপূর্বক অবশ্যই সেটি পরিস্রুত করে নিতে হবে। - ড. বেন মনটেট

এই পানির পরিমানটিও বেশ কম। যদি আপনার বাড়ির পেছনের বাগানের মাটিতে 20% পানির উপস্থিতি থাকে তাহলে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রতি ঘন মিটারে পানির পরিমান 0.02% । তাই সে শুষ্ক পানি থেকে পানযোগ্য পানি বের করার প্রক্রিয়াটি

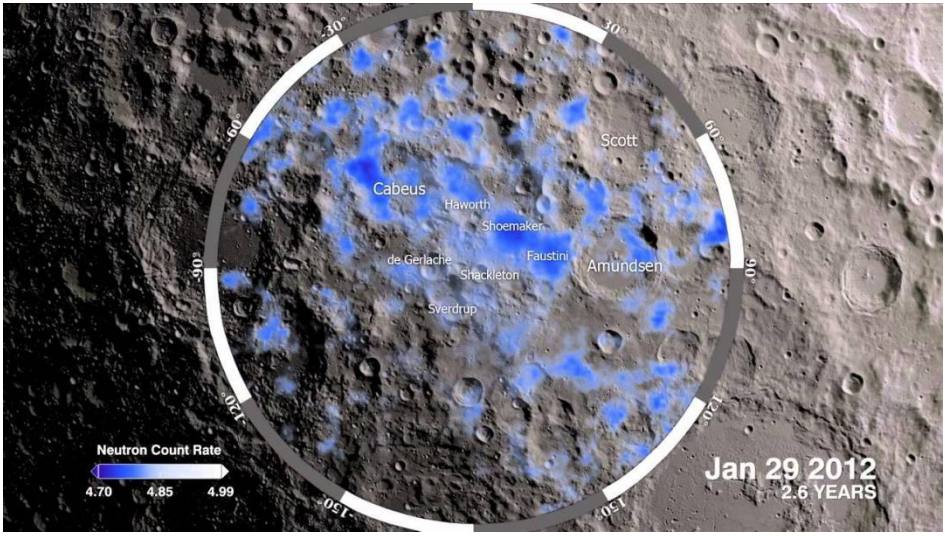

২০১৮ সালে সোফিয়ার সাহায্যে চাঁদের পৃষ্ঠে প্রায় ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে পানির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আগেই নানা তথ্য এসেছিল বিগত মিশনগুলো থেকে। চাঁদে পানির পরিমাণ বেশ কম ও তা চাঁদের ডার্ক সাইডে অবস্থিত। এছাড়াও আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এ পানি পৃষ্ঠের নিচে বদ্ধ অবস্থায় আছে।

তার মতে পৃথিবীর পানি আর চন্দ্রপৃষ্ঠের পানির মাঝে কোনো তফাত নাই। চন্দ্রপৃষ্ঠের পানিকে শিলাস্তর থেকে আলাদা করে নিয়ে কোনো সমস্যা ছাড়াই তা পান করা যাবে। কিন্তু পরিস্রুত করার এ প্রক্রিয়াটি বেশ দুরূহ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যেমন আর্থিকভাবে ব্যয়বহুল ঠিক প্রযুক্তিগত দিক থেকেও কম চ্যালেঞ্জিং নয়। তবুও বিজ্ঞানীরা বেশ আশাবাদী।

চাঁদের মাটিতে পানি এলো কীভাবে?

ধারণা করা হচ্ছে, এর পেছনে দুইটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত সৌরঝড় হাইড্রোজেন পরমাণুকে চাঁদের মাটিতে নিয়ে এসেছে, যা চন্দ্রপৃষ্ঠের সামান্য অক্সিজেনের ও খনিজের সাথে বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করেছে। দ্বিতীয়ত, পানি ধারণকারী কোনো মহাকাশীয় বস্তু যা চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল সেটিও এ পানির যোগানদাতা হতে পারে।

আপাতত আমরা নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারছি না।

চাঁদে পানি আছে এটা কি আমরা আগে থেকেই জানতাম?

২০০০ সালের দিকে চন্দ্রযান-১ ও ক্যাসিনি মিশন চাঁদে থাকা পানির অস্তিত্ব ডিটেক্ট করতে সক্ষম হয়। তবে সে-সকল মিশন হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না যে এটা আসলেই পানি কি না। বরং পানি ও হাইড্রোক্সিলের মাঝে একটা সন্দেহ বিরাজ করছিল। সোফিয়ার সাহায্যে সে সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

সূত্র -

Honniball, C. I., Lucey, P. G., Li, S., Shenoy, S., Orlando, T. M., Hibbitts, C. A., ... & Farrell, W. M. (2021). Molecular water detected on the sunlit Moon by SOFIA. Nature Astronomy, 5(2), 121-127.

"There's Water on the Moon?". Moon: NASA Science. Retrieved 2021-09-28 from https://moon.nasa.gov/news/155/theres-water-on-the-moon/

শেষ হয়েও হইল না শেষ...

আবার আসিব ফিরে...

ততদিন চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে

https://web.facebook.com/groups/tachyonts